প্রেম-দর্পণ।

(সত্য ঘটনা-মূলক উপন্যাস।)

শ্রীআর্জ্জমন্দ আলী কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা—৪০ নং কড়েয়া গোরস্থান লেন হইতে,

আজিজুদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৫৯ নং কড়েয়া রোড্,

রেয়াজুল-ইস্লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল গণি মিঞা সাহেব

অভিন্ন হৃদয়েষু।

আমার জীবন নীরস, হৃদয় অনুর্ব্বর। এ সংসারে অনবরতই কষ্টভোগ করিয়াছি। কষ্টের বিষম জ্বরে দেহ আমার জর্জ্জরিত হইয়াছে। সুখভোগ করা বোধ হয় আমার ভাগ্যে নাই, আপনার প্রণয়ই এহেন মরুতুল্য অনুর্ব্বর ও শুষ্ক হৃদয়ের একমাত্র ওয়েশিশ্! প্রিয়ম্বদ! আপনার ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া সময় ২ অত্যন্ত সুখভোগ করি। জগতে কয় জন আপনার ন্যায় সুহৃৎ প্রাপ্ত হয়? আপনার ভালবাসা প্রাপ্ত না হইলে, আমার হৃদয় বোধ হয় বিষম কষ্ট ও যাতনার লীলাভূমি হইয়া উঠিত; হৃদয়ের সুখ আমার হৃদয় হইতে চির দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রণয়াস্পদ প্রিয় সুহৃদ্! মহান্ খোদাতা-লা এ অভাগাকে আপনার ন্যায় প্রিয়জনের প্রণয় হইতে বঞ্চিত করেন নাই। আপনার ন্যায় প্রণয়াস্পদ বান্ধবের প্রেম প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয় গৌরবান্বিত।

যাহা হউক, আমার এ অনুর্ব্বর শুষ্ক হৃদয়ে আপনার প্রেম-বীজ পতিত হইয়া, শুষ্ক হৃদয় মরুভূমিও কতক পরিমাণে উর্ব্ব-

রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই উর্ব্বরতা দ্বারাই এই প্রেম-দর্পণের সৃষ্টি। অতএব যিনি এই বহির মূলীভূত কারণ, যাঁহার প্রেম বলেই এই সামান্য হৃদয় এই প্রেমদর্পণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহার হস্তে এই প্রেমদর্পণ উৎসর্গীকৃত হইল। প্রেম-দর্পণ অতি সামান্য বহি, ইহা সাধারণ সমীপে প্রকাশ করা বাতুলতা মাত্র। এই অনুপযুক্ত প্রেমদর্পণ আপনার হস্তেই অধিকতর শোভা পাইবে, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। বন্ধু-দত্ত পদার্থ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করুন।

শ্রীআর্জ্জমন্দ আলী।

ভদ্রেশ্বর।

বিজ্ঞাপন।

—০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এই যৎসামান্য ক্ষুদ্র "প্রেমদর্পণ" নামক বহি খানাতে আমার এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অনুপযুক্ত লেখনীর বলে, যথাসাধ্য সত্য ঘটনা বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বিশেষতঃ ইদানীং উপন্যাসে অনেক বিষয় কাল্পনিক চিত্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বহিখানিতে তাহা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে সাধারণের যদি ইহার প্রতি কটাক্ষ মাত্র পড়ে, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এই সত্য ঘটনা-মূলক উপন্যাস খানি পাঠে পাঠকগণ সন্তোষ লাভ করিবেন মনে করিয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করা হইল। দুঃখের বিষয়, এ সময় গ্রন্থকার অমূল্য চক্ষু-রত্নে বঞ্চিত হইয়া সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কিন্তু তিনি খোদাতা-লার উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া এ অবস্থায়ও শান্তি ভোগ করিতেছেন। মোস্লেম ভ্রাতৃগণ তাঁহার অবস্থার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক, তদ্‌চরিত এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠে কৃতার্থ করিবেন।

প্রকাশক।

স্তোত্র।

সদা প্রভু, অনন্ত জগৎ-ঈশ্বর
সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা
পরম পবিত্র মহাপ্রভু
খোদাতা-লার পবিত্রতম
ভক্ত হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধক
সুমিষ্ট নাম স্মরণ করত
ও
তাঁহার প্রেরিত পুরুষ প্রধান
অগ্রগণ্য বন্ধু, পরম ভক্ত দাসশ্রেষ্ঠ
হজরত মোহাম্মদের (দরুদ)
পবিত্র চরণার বিন্দ
বন্দনা করত
এই ক্ষুদ্রতম প্রেম-দর্পণ বহি খানা
আরম্ভ করিলাম।
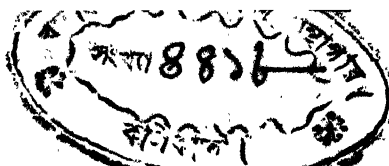
পরম করুণাময় আল্লাহতা-লার নামে আরম্ভ করিলাম।

প্রেম-দর্পণ।

১ম প্রতিবিম্ব।

বালিকা-প্রেম।

আজি পৌষ মাস এই মাত্র প্রভাত হইয়াছে, জগদান্ধকার নাশক নবীন ত্বিষাম্পতি, পৃথিবীর অনুপযুক্ত মানবমণ্ডলীর কুক্রিয়া সকল জগৎ সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান চিত্রে ধরিবার জন্য, জগতের পাপস্রোত কতক পরিমাণেও নিবারণ করিবার জন্য, এইমাত্র গগনমণ্ডলে উদিত হইয়াছেন। জগতের অন্ধকারও তৎসঙ্গে ২ মানব-হৃদয় নিহিত পরম অপার্থিব রত্ন আত্মার অন্ধকার বর্দ্ধক পাপের স্রোতও ধীরে ধীরে জগত পরিত্যাগ করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল; মেদিনী আলোকে পরিপূরিত হইল।

পৌষ মাসের রজনী বড়ই শীতল, তখন শীতের অত্যন্ত প্রকোপ। প্রাতে গগনমণ্ডল কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে। যে দিনের কথা বলা যাইতেছে, সে দিবসের প্রভাত কালও কুজ্ঝটিকায় আবৃত ছিল। প্রভাতে অপূর্ব্ব সুরে, অপূর্ব্ব তানে,

প্রভাত-বিহঙ্গম সুমিষ্ট বিভু সঙ্গীত, সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছে। ভাবুক বিহঙ্গম কাকলিতেও প্রভু মাহাত্ম্য প্রভু প্রশংসা শ্রবণ করাইতেছে। পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাবুক মানবের নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় না। সামান্য পরমাণুতেও পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ মানববৃন্দ, জগদ্ প্রভুর অনন্ত কৌশল উপলব্ধি করিতে পারেন। ভাবুকের জ্ঞাননেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে, মূর্খের তাহা হয় নাই—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু হায়! ভাবুকের সংখ্যা বর্ত্তমান কালে অতীব অল্প; মূর্খের সংখ্যা অধিক।

হে প্রভো! কতদিনে মূর্খের সংখ্যা অল্প ও ভাবুকের সংখ্যা অধিক হইবে? কতদিনে মানব, হে প্রভো! মানব নামের উপযুক্ত হইবে? কতদিনে হে সদয় প্রভো! জগতে পবিত্র প্রেমস্রোত ও শান্তি সুখের ধারা প্রবাহিত হইবে?

আমরা একটি সত্য ঘটনা লিখিতে বসিয়াছি। সত্য ঘটনা অবলম্বনেই এই উপন্যাস লিখিত হইবে। এই ইতিবৃত্তে গজপতি বিদ্যা দিগ্‌গজের ন্যায় হাসির অবতার না থাকিতে পারে, প্রফুল্ল অথবা দেবী চৌধুরাণীর ন্যায় নিষ্কাম ব্রতাভিষিক্তা রমণী না থাকিতে পারে, বিমলার ন্যায় রসিকা ও চতুরা রমণী না থাকিতে পারে, ভ্রমরের ন্যায় সতী না থাকিতে পারে, চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের ন্যায় আদর্শ পুরুষের চিত্রও না থাকিতে পারে এবং ও প্রতাপের ন্যায় আদর্শ পুরুষের চিত্রও না থাকিতে পারে এবং সর্ব্বশেষে কল্পনা অঙ্কিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রমণী—

দুর্গেশনন্দিনী, রেবেকা ও আয়েশার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে বোধ হয়, কোনও স্থানের বিশেষ কালের বিশেষ সমাজের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

যাহা হউক, এখন যাহা লিখিতে ছিলাম, তাহাই লিখিতে আরম্ভ করি।

প্রথমতঃ আমাদের এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত স্থানের কথঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

আমাদের এই সত্য ঘটনা-মূলক আখ্যায়িকা-বর্ণিত ঘটনা "সুন্দর হাট" নামক কোন জেলায় সংঘটিত হয়। তথায় আমির নগর নামক একটী ছোট খাট পরগণা অবস্থিত; তৎ পার্শ্বেই "পার্টোরি" নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। আমাদের আখ্যায়িকার সঙ্গে এই দুইটী স্থানের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, আর আর বিষয় সময় মতে উল্লিখিত হইবে।

পৌষ মাস প্রভাত হইয়াছে, অতি প্রত্যুষে, "পার্টোরি" নামক গ্রামের মধ্যভাগ দিয়া কয়েকটী অল্প বয়স্ক বালক পুস্তক হাতে পাঠশালায় যাইতেছে।

অন্ধকার তখনও সুন্দররূপে বিদূরীত হয় নাই; বালকগণ স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্তিশীল ও তেজীয়ান; উষার প্রথম দর্শনের সহিতই তাহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত পুথি কক্ষে লইয়া পাঠশালাভিমুখে দৌড়িতেছে, বিশেষ কারণে সে দিন প্রাতে স্কুল হইয়াছিল।

বালকগণ পাঠশালায় পঁহুছিল। সেখানে দেখা গেল, আরো

কয়েকটী বালক ও বালিকা পুস্তক হস্তে পাঠ করিতেছে। বালক বালিকা সকলেই হিন্দু; আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের মধ্যে একটী মুসলমান ছাত্রও নাই। ইহার কারণ এই যে "পার্টোরি" গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু। বালকদিগের বয়স ৫ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত। অতি অল্প বয়স হইলে বালিকাগণের ৫ বৎসর বয়স এবং অতি অধিক হইলে ৮।৯ হইতে ১২ বৎসর।

বালক বালিকাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, মধ্যস্থলে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া—সেই ক্ষুদ্র পাঠশালার একমাত্র অধিপতি পণ্ডিত মহাশয়।

পণ্ডিতও হিন্দু ব্রাহ্মণ, খর্ব্বাকৃতি, ইণ্টার মিডেডিয়েট্ পর্য্যন্ত বোধ হয় বিদ্যা, সীতার বনবাস পর্য্যন্ত বোধ হয় অধ্যয়নের শেষ সীমা।

পাঠশালায় বালক বালিকা একুনে ৪০ জন মাত্র অধ্যয়ন করে। ২।৩ জন মুসলমান ভদ্রলোক, স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিবেন, পূর্ব্বেই পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংবাদ আসিয়াছিল।

সময়ানুসারে পরিদর্শকগণ স্কুলে আসিয়া পঁহুছিলেন। তিন জন ভদ্রলোক শিক্ষাগারের দ্বারদেশে আসিয়া দর্শন দিলেন। তিনজনই মুসলমান ভদ্রলোক, পরিধানে ভদ্রলোকোপযুক্ত পরিচ্ছদ।

প্রথম পুরুষটী বোধ হয় ২২ বৎসর বয়স্ক, আকার দীর্ঘ, বর্ণ ফরসা, বদন মণ্ডলে ভাব ও প্রেমের আভাস বিরাজ করিতেছে।

লোকটীর আকার দেখিলে স্বভাবতঃই প্রতীয়মান হয়, দয়া ও স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে অধিক পরিমাণে বিরাজ করিতেছে। ইঁহার নাম মোহাম্মদ কাসেম। ইঁনি বাঙ্গালা উৎকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইংরেজীও যৎকিঞ্চিৎ জানেন, উর্দ্দু ও পারসি ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে।

দ্বিতীয় পুরুষটীও ভদ্রলোক, আকার খর্ব্ব, বর্ণ সম্পূর্ণ পরিস্কার নহে। শ্যামবর্ণ, ঈষৎ গোঁপ ও শ্মশ্রূর চিহ্ন মুখ-মণ্ডলে দেখা দিতেছে; তিনিও ইংরেজী বাঙ্গালাতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন, নাম আবদুর রহিম।

তৃতীয় জনও ভদ্রলোক, লেখা পড়া ভাল রূপে অবগত নহেন। নাম আবদুল কাদের।

১ম ও ২য় পুরুষ স্কুল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ১ম পুরুষটীর চক্ষু হঠাৎ একটী বালিকা মূর্ত্তির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল—অমনি তিনি স্তম্ভিত হইলেন। অনিমিষ লোচনে তাহার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যুবক দেখিলেন, ১২ বর্ষ বয়স্কা একটী বালিকা পুথি হাতে পাঠ করিতেছে।

বালিকার বদন অত্যন্ত মনোহর, গৌর ও গোলাপী বর্ণের মিশ্র সম্ভূত সুন্দর বর্ণ, তাহার গোলাপী বদনে নাজানি কি এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে, দেখিলেই তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। মস্তকের ঘন-কৃষ্ণকেশ রাশি সর্পাকার, মনোহর বদন-মণ্ডলে এলো খেলো ভাবে পতিত হইয়া বহুল পরিমাণে সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধন করিতেছে। সর্প মনুষ্যকে দংশন করে, কিন্তু

এ সর্পাকার কেশ যাহার নেত্র পথে পতিত হয়, তাহারই মরণ সুনিশ্চয়। তাহার মন অন্ততঃ ২।৪ দিন সে সুন্দর কেশের কথাই ভাবে।

তাহার বিশাল পটল চেরা চক্ষু দুটি হইতে প্রেমিক জনকে আয়ত্ত করিবার জন্য গম্ভীর কটাক্ষ শর নিক্ষিপ্ত হয়,—তাহার আকর্ণ-বিস্তারিত ধনুক স্বরূপ ভ্রুযুগল, তাহার ঈষদুচ্চ অথচ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক চারু নাসিকা, সুন্দর পাতলা ওষ্ঠাধর, হংস সদৃশ গ্রীবাদেশ, চারু মৃণাল ভুজ, ক্ষীণ কটিদেশ, সুন্দর চরণারবিন্দ এসব দর্শনে লোক মুগ্ধ হয়, সমস্ত শরীরে তাহার যেন সৌন্দর্য্য খেলিতেছে; সরলতা তাহার চারু বদনমণ্ডলে বিরাজমান।

সে চারুনেত্রার বিশাল চক্ষেই যেন তাহার সবল সরল হৃদয়ের প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত আছে, সে নয়ন দেখিলে তাহার হৃদয়ের ভাব সুন্দররূপে উপলব্ধি হয়।

বালিকার ১২ বৎসর বয়সেই এতদূর সৌন্দর্য্য, যৌবনে না জানি কতদূর বর্দ্ধিত হয়। সৌন্দর্য্য এখন যদিও পরিপক্ক হয় নাই, তথাপি এমন লোক বিরল যে, একবার এই সৌন্দর্য্য প্রতিমা দর্শন করত মুহূর্ত্তের জন্যও বিমুগ্ধ না হয়।

বালিকার সৌন্দর্য্য তাহার গ্রামে বিখ্যাত; তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা গ্রাম ত্যাগ করত দিগ্‌দিগন্তরে লোকের কর্ণে পঁহুছিয়াছে।

ফলতঃ ইহার ন্যায় সুন্দরী বালিকা তাহার গ্রামে কিম্বা নিকটস্থ পরগণায়ও নাই।

অনেকে অনেক চক্ষে এই চারুনেত্রা বালিকাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, অনেকেই দেখিয়া মুহূর্ত্ত কিম্বা দুই মুহূর্ত্তের জন্য বালিকার সৌন্দর্য্য চিন্তা করত মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার পরেই নিজ নিজ কার্য্যে রত হইয়াছেন।

কিন্তু কাসেম আজ যে চক্ষে বালিকাকে দর্শন করিলেন, অনন্তকাল সে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তিনি সে চক্ষেই দর্শন করিবেন। আকস্মিক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তিনি এই সুন্দরীর অনিন্দ্য রূপে মুগ্ধ হইলেন। জীবনের এ মোহ আর তাঁহার কখনও পরিত্যাগ করিল না—সরল চিত্ত যুবার সর্ব্বনাশ সাধন করিল।

যুবক মনে মনেই তাহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নির্দ্ধারিত করিলেন। বালিকা অজ্ঞাত ভাবে যুবক-হৃদয় ক্রয় করিল, যুবকের হৃদয়ে বালিকা-প্রেম স্রোত উথলিয়া উঠিল। মোট কথা, যুবক বালিকাকে ভাল বাসিতে লাগিল। হৃদয়ে প্রেম-অঙ্কুরিত হইল।

অনেকে এ প্রেম-কাহিনী শ্রবণ করত হাস্য করিয়া বলিতে পারেন যে, এখনও আর কি প্রেমের সময় আছে? আমরা বলিব, প্রেম সকল সময়েই মানব হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে প্রেম বর্ত্তমান, প্রেম অপার্থিব বৃত্তি বিশেষ। সময়ানুসারে প্রেম-বৃত্তিও সম্পূর্ণতা লাভ করে। প্রেম-শূন্য মানব, মানবই নহে। তবে প্রত্যেক মানব সমানাংশে প্রেম প্রাপ্ত হয় নাই। কাহারও হৃদয়ে প্রেম অধিক পরিমাণে,

কাহারও হৃদয়ে অল্প পরিমাণে বিরাজ করে। অল্পই হউক আর অধিক পরিমাণেই হউক, সংসারে এমন ব্যক্তি বিরল, যিনি কখনও কাহাকে ভাল বাসেন নাই। যদি এমন কেহ হইয়া থাকেন, তিনি জিতেন্দ্রিয়ই হউন আর মহা তাপসই হউন—আমি তাহার সহবাস বাসনা করিনা। এমন প্রস্তরবৎ শীতল ও কঠিন হৃদয়ের সহিত কে বাস করিতে চায় ?

আমরা বলিয়াছি যে, প্রেম সকলের হৃদয়েই কতক পরিমাণেও বর্ত্তমান আছে। জগতে এমন মানব বিরল, যিনি কখনও কাহাকে ভাল বাসেন নাই।

কিছু না কিছুর উপর প্রেম স্থাপন না করিলে এ বৃত্তি কার্য্যাভাবে অচল হইয়া যায়, সুতরাং মানব জীবনে কিছু না কিছুর অভাব পড়ে, হৃদয়ের কিছু না কিছুর অভাব বোধ হয় ; তদ্ধেতু মন সম্পূর্ণ সুখলাভ করিতে পারে না। বৃত্তির অক্ষমতাহেতু বিমর্ষতা (Melaucholey or Hyppochondria) হৃদয়ে প্রবেশ করে, জীবন দুঃখের আবাস ভূমি হইয়া যায়।

অতএব মানবের স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম এই যে, মানব কোন না কোন বস্তুর প্রতি তাহার প্রেম স্থাপন করে।

প্রেমের প্রকৃত লক্ষ্যস্থল খোদাতা়-লা। প্রেমের চরম এবং প্রকৃত অবস্থাই ঈশ-প্রেম। হঠাৎ খোদার বিনানুগ্রহে কেহ ঈশ-প্রেম লাভ করিতে পারে না। ধীরে ধীরে বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে ঈশ-প্রেম লাভ করা যায়।

প্রথমতঃ সামান্য বস্তুর উপর প্রেম স্থাপন করত প্রেমের

রজ্জু ধীরে ধীরে ধারণ পূর্ব্বক, অগ্রসর হইতে ২ তদপেক্ষা মহত্তর বস্তুর ভালবাসা স্থাপন করা, ইহাই মানব স্বভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এবং ইহারই চরম ফল ঈশ-প্রেম। জগতে যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, মানব স্বভাবতঃ তাহাই ভালবাসিয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ মানবের প্রেম, রমণীর প্রতি প্রেম স্থাপনের বৃত্তি বিফল না হইয়া সোৎসাহে মহত্তের দিকে চলিতে থাকে।

এরূপ লোক হইতে বিজ্ঞতর ও মহত্তর লোকগণ স্বদেশের প্রতি প্রেম, কেহ কেহ বা সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর প্রতি প্রেম, অবশেষে প্রেমের মূলীভূত করণ প্রভু খোদাতা-লার প্রতি স্থাপন করে, এবং ইহাই প্রেমের চরম সীমা।

বাল্যকালে বৃত্তি সকল যদিও সতেজ থাকে, কিন্তু চরিতার্থ হয় না। যৌবনে বৃত্তি সকল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে। সেই অধীরতা গুণেই কোন না কোন বস্তু-কেহ ভাল বাসে। এজন্য সময় ২ দৃষ্ট হয় যে, যৌবনে যে বস্তুকে ভাল বাসা যায়, প্রৌঢ়ে সে বস্তুকে নিতান্ত বিরক্তি জনক বোধ হয়। ইহা এই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার জন্য মত্ততার ফল।

অবস্থা ভেদে, রুচি ভেদে ও শিক্ষা ভেদে, মানবের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম মার্জ্জিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাহার ব্যত্যয় হয়।

নিকৃষ্টতর মানবের মধ্যে প্রেমের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তাহার হৃদয় নিহিত অপার্থিব ধন প্রেম, পরিচালন অভাবে

শুষ্ক হইয়া ধ্বংশ হইয়া যায়। জীবন প্রেম-শূন্য অথবা ধর্ম্ম-শূন্য হইয়া উঠে। এখন জগতের অধিক পরিমাণে মানব-হৃদয়ই প্রেম শূন্য; প্রেম হৃদয়ে না ফলিলে মানবাত্মার কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। আত্মার দুর্দ্দশা হইতে আরম্ভ হয়, আত্মা কলুষিত হইয়া যায়।

বিবাহের মূল উদ্দেশ্য প্রেম বৃত্তি পরিচালনা করা। কেবল পাশব ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা কখনও বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। প্রেমের সাহায্যকারী বলিয়াই বিবাহের এত আদর, কিন্তু হায় পরিতাপ! পৃথিবীতে এখন বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা শুধু যে জীবনের লক্ষ্য, সে জীবন পামর জীবনে পরিণত হইয়াছে; সে মানব জীবন নহে। বিবাহ প্রেমবৃত্তি পরিচালনা করিবার প্রধান উপায়, আবার প্রেম পরিচালনা করা ঈশ-প্রেম লাভ করিবার প্রধান উপায়। ঈশ-প্রেম আবার ঈশ্বরে সম্মিলিত হইবার প্রধান উপায়, এবং ঈশ্বরে সম্মিলিত হওয়াই জ্ঞান ও সত্যতার চরম সীমা—চরম লক্ষ্য। মানব জীবনের উদ্দেশ্য মানব সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য, অতএব বিবাহই চির শান্তি ঈশ্বরে মিলিত হইবার প্রধান উপায়।

উপরে যতদূর লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রেমই মানব জীবনের সার বস্তু এবং ইহা ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল হৃদয়েই বিরাজ করিতেছে।

২য় প্রতিবিম্ব।

—o—
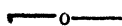
কাসেমের প্রেম।

কাসেম বাটীতে ফিরিলেন, সে চন্দ্রাননা তরুণ বালার চারু হস্তে হৃদয় মন সমর্পণ করত বিমর্ষ চিত্তে যুবক বাটীতে ফিরিলেন। প্রথম প্রেমের পরে হৃদয়ে যে প্রবল ঝড় উঠে, সুন্দররূপে সে ঝড় সহ্য করা মানব হৃদয়ের সাধ্যাতীত। ভালবাসায় পতিত হওয়া সহজ, কিন্তু প্রেম-জাল দুর্ব্বার কষ্টময়। জগতে অতি অল্প লোক সে কষ্ট সহ্য করিতে পারেন।

যে মুহূর্ত্তে তুমি প্রেম-ফাঁদে পতিত হইলে, তখনই তুমি বিষম কষ্টের দ্বারদেশে পঁহুছিলে। তখন হইতেই তোমার কষ্টের আরম্ভ হইল। তখন হইতেই তোমার জীবন দুঃখময় হইয়া গেল।

একরূপ প্রেমের লক্ষণ কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ কমল দেখিয়াই সুখ। তুমি প্রেমিক সমীপে প্রেমিকাকে ধরিয়া রাখ, প্রেমিক অনিমিষ নয়নে সে মুখমণ্ডল হইতে রূপ-সুধা পান করত পরিতৃপ্ত হইতেছেন; আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই—চারু বদন কমল দেখিয়াই তাহার সুখ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি প্রেমিকাকে প্রেমিকের নয়ন পথ হইতে দূরে স্থাপিত করিলে, সে মুহূর্ত্তেই বিষম দুঃখ আসিয়া প্রেমিককে আক্রমণ করিল।

তোমার হস্ত, সূর্য্য সম্মুখে ধরিয়া দাও; সূর্য্যোত্তাপ তুমি বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু যখন তুমি একখানি কাগজ তদ্-সম্মুখে ধারণ করিলে, অমনি তোমার হস্ত শীতলতা অনুভব করিতে লাগিল।

সেইরূপ যতক্ষণ প্রেমিকা, প্রেমিকের সম্মুখে উপবিষ্টা থাকে, ততক্ষণ প্রেমিক তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখ-চন্দ্রের বিমল রূপ-সুধা পান করত সুখে মগ্ন থাকে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রেমিকা, প্রেমিকের নয়ন পথ হইতে বিদূরীত হয়, তখনই প্রেমিক বিষম কষ্টভোগ করিতে থাকেন। প্রথম প্রণয়ের এই ফল।

প্রেমের প্রথম সোপান, মানবের ভালবাসার পদার্থকে দেখিয়াই সুখ; কোন কোন প্রেমিক কিম্বা প্রেমিকার সমস্ত জীবনেই এইরূপ প্রেম থাকে; অধিকাংশ লোকের পরিবর্ত্তন হয়।

প্রথমতঃ প্রেমে পতিত হওয়ার পর হৃদয় যে দুঃখ সাগরে অভিষিক্ত হয়, ইহাই তাহার কারণ। বালিকাকে যুবক পাঠ-শালায় দর্শন করিলেন, বালিকাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করিল।

যতক্ষণ বালিকা তথায় উপস্থিত ছিল, যুবক ততক্ষণ সুখ ভোগ করিলেন; কিন্তু অবেশষে বালিকা চলিয়া গেল; যুবকেরও হৃদয় অন্ধকারে পরিপূরিত হইল—বিষাদ সিন্ধুতে হৃদয় নিমগ্ন হইল। সে দুঃখ সহ্য করা সকল লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে;

যুবক বাটীতে আর সে মধুর রূপরাশি দর্শন করিতে পাই-লেন না। তাই তাঁর হৃদয় দুঃখে মগ্ন থাকিল। হৃদয়ে আর সুখ নাই, দুঃখ সে হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।

কাসেম বাটীতে প্রত্যাগমন করত বিমর্ষ চিত্তে কল্পনা-তুলিকা দ্বারা হৃদয়-পটে বালিকা মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, বালিকার কথা চিন্তা করিতে ২ কয়েক দিবস যাপন করিলেন। বালিকার প্রেম, তাহার প্রেম-বীজ রোপণোপযোগী উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বালিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন।

যুবকের হৃদয়ে যাহার মোহন মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, সে ভাগ্যবতী রমণী কে, কাহার কন্যা, জানিবার জন্য যুবকের—সম্ভবতঃ পাঠকবৃন্দেরও ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত। মানবের স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম এই যে, কোন মানব যাহাকে ভালবাসে, তাহার সম্বন্ধে প্রত্যেক কথা জানিতে সে ইচ্ছুক হয়। যাহাকে ভাল-বাসি, সে কে, কাহার কন্যা, কিরূপ কার্য্য করে, কিরূপে বাস করে, কিরূপ স্বভাব—ইত্যাদি জানিতে আমরা স্বভাবতঃই নিতান্ত ইচ্ছুক হই।

যুবক বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তাহার হৃদয় মোহিনীর নাম ক্ষেত্রমণি—জাতিতে হিন্দু, দেব কুলোদ্ভবা; সে পার্টোরি গ্রামের বিখ্যাত ধনী মৃত ভূপতি সিংহের একমাত্র স্নেহ-বর্দ্ধিতা কন্যা। জানিলেন, ক্ষেত্রমণি তাহার বিধবা জননীর সঙ্গে একা বাস করিতেছে, এ পর্য্যন্ত কোন ভাগ্যবান্ তাহার

পাণিগ্রহণ করেন নাই। এক বাটীতেই তাহার পিতৃব্য তনয় ও অন্যান্য আত্মীয়েরা বাস করে।

পাঠক, মুসলমান যুবকের প্রণয়ের পাত্রী সে কে? হিন্দু-ক্ষেত্রমণি। প্রেমের নিয়ম এই যে, ইহা কখনও ধর্ম্ম বা জাতির মুখাপেক্ষা করে না। অনেক সময় চক্ষে না দেখিয়াও কেবল কাহারও গুণগ্রাম শ্রবণেই লোক প্রেমে পতিত হয়, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু এরূপ প্রণয়ে প্রায়ই যে বিষম বিষময় ফল ফলে, পাঠক বোধ হয় তাহা অবগত আছেন। এরূপ প্রণয়ে জগতে অতি অল্প লোকই সুখী হইয়াছেন।

কা.সম ভাবিলেন যে, যাহাকে তিনি ভাল বাসিয়াছেন, তিনি নীচ বংশীয়া হিন্দু। কিন্তু নীচ কুলে কি কভু উজ্জ্বল রত্ন জন্ম গ্রহণ করে না? নীচ বংশে কি কভু সুন্দরী ও গুণান্বিতা রমণী জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না? ইতিহাস অনুসন্ধান কর, যথেষ্ট উত্তর পাইবে। সুকবি টমাস্ গ্রের লিখিত বিখ্যাত পদ্য প্রবন্ধ ইলিজী পাঠেই ইহার যথেষ্ট উত্তর পাইবেন।

যাহার হস্তে প্রকৃতরূপে একবার প্রাণ সমর্পিত হইয়াছে, সে জন ভালই হউক মন্দই হউক, উচ্চ বংশীয়াই হউক বা নীচ বংশীয়াই হউক, তাহা ফিরাইয়া আনা বড়ই কষ্টকর। ক্রীত বস্তু কি ক্রেতা কভু পরিত্যাগ করে, অথবা বিক্রেতাকে কি ফিরাইয়া দেয়?

ভালই হউক আর মন্দই হউক, উচ্চ বংশীয়াই হউক আর নীচ বংশীয়াই হউক, যুবক স্বীয় মন প্রাণ তাহার চরণার বিন্দে

সমর্পণ করিয়াছেন; এখন আর ফিরাইয়া আনিতে পারেন না। সে রাঙ্গাপদ তখনও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে।

যুবক তাহার বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন, যুবক অবশেষে পার্টোরি গ্রামের দিকে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

—o—

৩য় প্রতিবিম্ব।

আমির নগর।

যুবকের সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা এখন পর্য্যন্ত দেই নাই, এখন আমাদের দেওয়া আবশ্যক।

আমির নগর নামক ছোট খাট পরগণার কথা আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি, সেই পরগণার সঙ্গে এই আখ্যায়িকার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

আমির নগরের অন্যতম প্রাচীন নাম ভদ্রেশ্বর, সুরমা নদীর পারে অবস্থিত। তত্রত্য কোনগ্রামে আধুনিক একজন সুকবি * জন্মগ্রহণ করিয়া সেই দেশকে সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন। বোধ হয়, পরম করুণাময় খোদাতা-লা আমির নগরবাসিগণের

* First it was to mo like a heavenly rose but gradual-ly I found black insect in a bosom or my bed of rose is terned now bed of thorn.

সহায় হইয়া, তাহাদের মানসিক ও সামাজিক তমঃরাশি দূরীভূত করণ মানসে প্রতি ঘরে ঘরে জ্ঞান ও বিবেক-প্রদীপ প্রজ্বলিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সুকবির সৃষ্টি করিয়াছেন। আহা বৃক্ষ তরুণ, অতি তরুণ ; ফলের বোঝা অধিক, অতি অধিক ; দুরন্ত কাল যেন তাহাতে হৈমন্তিক শুষ্ক পবন প্রবাহিত না করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহার কাব্য কানন প্রস্ফুটিত কুসুম-গন্ধ, তদ্দেশ বাসীর নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় নাই, সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া মরুভূমিতেই শুধু গন্ধ বিস্তার করিতেছে।

আহা! আমির নগর বাসীরা এই অতুলনীয় মণির বিমল আভা কিছুই টের পাইল না ; তাহারা পাইবেই বা কেন? তাহারা যে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, নাসিকা থাকা স্বত্বেও ঘ্রাণশক্তি হীন। কেবল বিলাসিতা তাহাদিগের মস্তিষ্ককে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। এই কবির জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে বহির কলেবর বৃদ্ধি হইবে বিধায়, অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা এস্থলে পরিত্যাগ করা হইল।

খোদা করুন, কালে যেন ইহার সৌরভে দিগ্‌দিগন্তর আমোদিত হয়, এবং গন্ধামোদে 'কাব্য রসাদি ভ্রমরবৃন্দ তদীয় রচিত কবিতা প্রসূন হইতে মকরন্দ পান করিতে যেন বঞ্চিত না হন। আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে লিখিতেছি যে, এই ক্ষুদ্রতম প্রেম-দর্পণখানিতেও একবার তাঁহার কটাক্ষ পড়িয়াছে। ধন্য সেই সৌভাগ্যবতী শুক্তি—যিনি এহেন অনুপম মুক্তাকে

গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহার চরণার বিন্দে আমার শত শত সভক্তি অভিবাদন। হে জগদ প্রভো! আমি লোকালয়ে বা গিরি কন্দরে—জাহ্নবী তীরে যেখানেই থাকি, তথায়ই যেন এই সুকবির কবিত্ব-রস পান করিয়াও তাহার পবিত্র মোহনীয় মূর্ত্তিকে কল্পনা তুলি দ্বারা চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি। আমি এক্ষণে আমির নগরের অপরাপর বিষয় আলোচনা করিব।

আমির নগর পরগণার প্রধান অধিবাসী মুসলমান; হিন্দু সংখ্যা অল্প। পরগণার ভদ্রলোক সকলই মুসলমান, নীচ বংশীয়েরা প্রায় সকলেই হিন্দু। এখানকার ভদ্রলোকেরা কিন্তু সকলেই সঙ্গতিপন্ন নহেন। স্থান অল্প এবং জমিদার সংখ্যা বোধ হয় প্রজা সংখ্যাপেক্ষাও অধিক। কিন্তু এহেন জমীদার দিগের বংশ-মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক। এমন কি, তাঁহাদের অহঙ্কার দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, এক এক জন লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি! অহঙ্কারী লোকদের মধ্যে সাধারণতঃ অতি অল্প লোকই বিদ্যার সুবিমল সৌরভ প্রাপ্ত হন; আমির নগরেও যাহারা অহঙ্কারী, তাহারাও বড় বিদ্যার সৌরভ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু অপর দিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, আমির নগরের প্রায় সকল লোকই অধম দাসত্ব-ব্যবসায়ী ইংরাজ কর্ম্মচারী। প্রকৃত বিদ্বানের সংখ্যা আমির নগরে অতি অল্প। আমির নগরবাসী লোকেরা মনে মনে এই ধারণা করে যে, যিনি গবর্ণমেণ্টের প্রধান দাস, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্। বিদ্যাশিক্ষার প্রধান

উদ্দেশ্য তাহাদের মতে "অর্থোপার্জ্জন"। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমির নগরবাসিরা মনুষ্যত্বের কিম্বা মহত্বের ধার বড় একটা ধারে না। যাহার অর্থ অধিক, সে পিশাচ হইলেও তাহাদের মতে তিনিই প্রকৃত মানব। দরিদ্র যে, সে যদিও মহৎ হয়, তাহাদের মতে সে নরাকার পশু। শুধু অর্থ দ্বারা কভু সমাজ উন্নত হয় না। যে সমাজের মনে এখন পর্য্যন্ত এই ধারণা রহিয়াছে যে, বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই ধন, সে সমাজের শীঘ্র কল্যানের সম্ভাবনা নাই, সে সমাজ উন্নত হইতে এখনও অনেক দিন বিলম্ব রহিয়াছে। আমরা এখন আমির নগরের সামাজিক বিষয় কিছু আলোচনা করিব। সামাজিক ঘটনা সকল যতই সমাজ সম্মুখে বহিষ্কৃত করা যায়, সমাজের ততই মঙ্গল। সমাজের আবর্জ্জনা রাশি যাহাতে বিদূরীত হয়, সেই বিষয়ে প্রত্যেক সহৃদয় লোকের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। রোগ নির্নীত না হইলে চিকিৎসক ব্যবস্থা করিতে পারে না ও রোগীকে অন্য ঔষধ দিয়াও আরোগ্য করিতে সক্ষম হন না; প্রথমতঃ রোগীর রোগ নির্ণয় করা উচিত।

এইরূপে প্রথমতঃ সমাজের দোষ সকল সমাজ-সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া, ও সমাজের দোষ নির্ণ্ণয় করা উচিত। এইরূপ হইলে এই সব দোষাদি দূরীকরণ মানসে তদনুরূপ ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সমাজেই নানা দোষজনক ক্রিয়া কাণ্ডাদি সংঘটিত হয়, তিনিই প্রকৃত সাহসী—যিনি সমাজকে এ বিষয় অবগত করেন; এবং তিনিই প্রকৃত পক্ষে সমাজের

মঙ্গলকারী। পক্ষান্তরে যাহারা এসব বিষয় গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, তাহারা কাপুরুষ, বিশ্বাস ঘাতক, সমাজের পরম অনিষ্টকারী, দুষ্ক্রিয়ার পৃষ্ঠপোষক ও প্রশ্রয় দাতা। এরূপ ঘটনা প্রকাশে সমাজের অনিষ্ট না হইয়া প্রভূত মঙ্গল উৎপাদিত হয়। কিন্তু ভাগ্যদোষে এরূপ সাহসী লোক এখন অতি বিরল। সকলেই এখন রুদ্ধকণ্ঠ—সুতরাং কণ্ঠস্ফুরণ করিতে কুণ্ঠিত। সমাজের সাহসী দল জাগরিত হও, সমাজকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার কর। সমাজ পাপের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে, শীঘ্রই অধঃপাতে যাইবে, প্রতিকার করিলে এখনও সজীব এবং উন্নত হইতে পারে। আবার বলি, জাগরিত হও—পাপীদিগের ভয়ের কারণ ও পুণ্যাত্মার সন্তোষ বর্দ্ধক হও।

আমির নগরের সামাজিক অবস্থা অতি শোচনীয়; জগতে এমন পাপ বোধ হয় নাই, আমির নগরে যাহার অভিনয় হইতেছেনা। আমির নগর বাসীরা ধর্ম্ম ও নীতির অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিতেছে। আমির নগরে এমন লোক অতি বিরল, যাহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে। পাপ ও অধর্ম্ম আমির নগরের প্রতি দ্বারে ২ ভ্রমণ করিতেছে। আমির নগর বাসীরা সে পাপ ও অধর্ম্মকে তাড়াইতে প্রস্তুত নহে—বরং তাহারা তাহাদিগকে সমাদরে আহ্বান করে। আমির নগর ধর্ম্ম জগতে কতদূর দুর্ব্বল হইয়াছে, আমির নগর বাসী লোক দিগের ধর্ম্মের প্রতি কতদূর আস্থা ও বিশ্বাস আছে, তাহা নিম্ন-লিখিত আমির নগর বাসী, সংসার-প্রিয়, বৃথা গর্ব্বিত, কলহ ও দ্বন্দ্ব-প্রিয়,

নিরীহ লোক জনের উৎপীড়ক লোকগণের, তাহাদের স্বজাতীয় মনুষ্য ভ্রাতাগণের প্রতি জঘন্য ব্যবহার পাঠ করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমির নগর বাসী লোকগণ সামাজিক দুই ভাগে বিভক্ত। এক দলের সহিত অন্য দলের অহরহ ঘোর কলহ ও বাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। এই দুই দলের অহরহ কলহ ও বিবাদে আমির নগর উত্তপ্ত মরুভূমি তুল্য বিভীষণ শ্মশানাকারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই দুই দলের তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই। অকপটে সত্য কথা বলিতে গেলে বলিব, আমরা যতদূর বোধ করিতে পারি, এই দুই দলের নেতা মহাশয়গণ অত্যন্ত ধর্ম্ম-জ্ঞান শূন্য। কেবল বাহ্যিক নিয়ম গুলি পালন করিলে, বাঁধা গৎ মতে চলিলে লোক প্রকৃত ধার্ম্মিক হয় না। হৃদয় চাহি, হৃদয় নহিলে লোক কখনও প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারে না। তাই এই নগরের এক দলের লোক অন্য দলের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া কাণ্ডে আহার করিতে নিতান্ত অসম্মত। এমন কি, নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য কর্ম্মে ও এই বিধর্ম্মী জনোচিত কার্য্যাদি সংঘটিত হয়। এই পাপ পরিপূর্ণ, পাপদূত-সঙ্কুল আমির নগরে পবিত্রাত্মা হজরত মোহাম্মদ (দরুদ) এর মৌলুদ শরীফে, অথবা ফাতেহা ইত্যাদি ধর্ম্ম কার্য্যে এক দল অন্য দলকে নিমন্ত্রণ ও এক সঙ্গে আহার করেনা। মুসলমানী ধর্ম্ম-সূত্রের প্রধান বন্ধনী একতা তাহাদের মধ্যে আর নাই। আমরা অবগত

আছি যে, কখনও কোন লোক, অপর দলস্থ কয়েক জন ধার্ম্মিক পুরুষকে মৌলুদ শরিফে নিমন্ত্রণ করায়, তদীয় দলস্থ অন্যান্য লোক সকল ঐ বেচারাকে অত্যন্ত ভয় দেখাইয়া, ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। আহা! কি দুঃখের বিষয় যে, আমির নগর এতদূর পাপে নিমগ্ন রহিয়াছে। আমির নগর বাসী অহঙ্কারী মানবগণের বাহ্যিক আড়ম্বর-পতাকা অভ্রভেদী হইয়া, উহার আশু ধ্বংসত্বের প্রমাণ, হৃদয়-বান্ লোকের হৃদয়ে মুহুর্মুহু জাজ্জ্বল্যমান চিত্রে প্রমাণ করিতেছে। হে আমির নগর বাসী মানবগণ! আমি খোদাতা-লার নামে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে কোন হৃদয়বান্ পুরুষ থাকিলে জাগরিত হও; অধর্ম্ম ও কুসংস্কার জনক তিমির রাশি বিদূরিত করিয়া দেশে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিত, পাপ-পূর্ণ আমির নগরকে ধর্ম্ম-কিরণে উদ্ভাসিত কর।

যে কোন বিদেশী ধার্ম্মিক, পথিক আমির নগরে প্রবেশ করিয়াই পাপের খেলা ও অধর্ম্মের নৃত্য, প্রতি ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, আমির নগরের লোকদিগের ধর্ম্মের প্রতি একটুও শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের পরিচ্ছদের দিকেই দৃষ্টি করিয়া বিদেশী বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাদের মনেও ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। ধর্ম্ম গ্রন্থে যাহাদিগকে শয়তানের দাস দাসী বলিয়া অভি-হিত করা গিয়াছে, ও যাহাদের আকার প্রকার নির্দ্দেশ করা

গিয়াছে, আমির নগরে এরূপ পুরুষ ও রমণী দলে দলে বিরাজ করিতেছে।

আমির নগরবাসী মুসলমানগণ স্বীয় ধর্ম্ম—ইচ্ছা-প্রণোদিত ধার্ম্মিক জনোচিত পোষাক পরিত্যাগ করিয়াছে। কোন পুরুষ কিম্বা কোন রমণীর পরিচ্ছদ দর্শন করিলে, ভক্তি কিম্বা ধর্ম্মের বিষয় মনে উদিত হয় না; বরং তৎপরিবর্ত্তে অধর্ম্ম ও অশ্রদ্ধার কথা মনে উদিত হয়। আবার দেখ, ধার্ম্মিকজনোচিত ক্রিয়া-কাণ্ড ও আমির নগরে খুজিয়া পাইবেন না। যে সকল ক্রিয়া-কাণ্ড এখানে সংঘটিত হয়, তাহা ধর্ম্মের বিপরীত। উপাসনার নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, তুমি উপাসনার জন্য কাহাকেও খুজিয়া পাইবেনা; মহান্ খোদাতা-লা যে সকল অপরিহার্য্য নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এখানে তাহার কিছুই চিহ্ন পাইবে না।

আমির নগরের লোক সাধারণতঃ উগ্র, দুর্ব্বিনীত, ও কুরুচিপূর্ণ; রমণীগণের স্বভাবও যে এইরূপ, তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি। ধর্ম্ম-বীজ যাহার হৃদয়ে বপন করা হয় নাই, সে নিশ্চয়ই উগ্র ও দুর্ব্বিনীত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানব-হৃদয়ের প্রধান ও উজ্জ্বলতম ভূষণ বিনয়ের মুলই ধর্ম্ম। যিনি ধার্ম্মিক, যাও তুমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে বিনয়ী কিনা? যদি বিনয়ী না হয়, তবে নিঃসন্দেহই জানিয়া রাখ, সে ধার্ম্মিক নহে; ধার্ম্মিক কখনও উগ্র হইতে পারে না। বাল্যকাল হইতে যে হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ বপন করা হয়, সে হৃদয়

নিশ্চয়ই চিরজীবন বিনয় অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত রহিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বালকের বিনয় ও উগ্রতা ইহার জন্যই সম্ভূত হয়। তুমি ধর্ম্ম-বীজ তোমার ছেলের হৃদয়ে বপন কর, সে যদি কখনও দুর্ব্বিনীত হয়, তবে আমার কোন কথা বিশ্বাস করিও না—বরং বহিখানি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিও। উগ্রলোক কখনও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, উগ্র-হৃদয়ে ধর্ম্ম থাকিতেই পারে না। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়, উগ্রতার সঙ্গে কখনই বিনয় থাকিতে পারে না। হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ না থাকিলে বদন মণ্ডলেরও মাধুর্য্য চলিয়া যায়; মাধুর্য্য যে বদনে নাই, সে বদনে কর্কশতা আছে—মানুষ তাহা দেখিয়া সুখ পায় না। জগদ বিমোহিনী রমণী যাহার বদনমণ্ডলে মাধুর্য্য ক্রীড়া করিতেছে, বিনয় নম্রতা বদনে প্রকাশিত হইতেছে—যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সে কখনও অসতী হয়, তবে তুমি তাহার প্রতি চাহিয়া দেখ, সে মাধুর্য্য নাই, সে বিনয় নাই, সে হাসিভরা মুখও নাই। মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে কর্কশতা—বিনয়ের পরিবর্ত্তে উগ্রতা—হাসির পরিবর্ত্তে বিমর্ষচ্ছায়া তাহাতে প্রকটিত। অসতী কামিনীর মাধুর্য্য, বিনয় ও প্রফুল্লতা থাকিতে পারে না, তাহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হইতে পারে না—কণ্ঠস্বরে কিছু না কিছু কর্কশতা থাকিবেই থাকিবে।

বালক যখন অল্প বয়স্ক, তখন সর্ব্বদা দাস দাসীর সঙ্গে থাকে, দাস দাসী নীচ ও কুরুচি পূর্ণ লোক; বিশেষতঃ প্রায়ই মন্দ স্বভাব বিশিষ্টা। শিশু জগতে নবাগন্তুক, সে যাহা শুনে,

তাহাই আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে। দাস দাসীদিগের কুরুচি পূর্ণ গল্পাদি আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে, এই জন্য ধর্ম্ম-বীজের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম ও সুরুচির পরিবর্ত্তে কুরুচি বীজ, তাহার হৃদয়ে নিহিত হয়।

নূতন শিশু সর্ব্বদা যে সহবাসে থাকে, সে সহবাসের বীজই তাহার হৃদয়ে নিপতিত হয়। সে যেরূপ লোকের সহবাস করে, নিজেও সেরূপ লোক হয়, এইটী স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

আমির নগরের ভদ্রমহিলাদের একটী অতি জঘন্য নিয়ম যে, তাহারা দাস দাসীর প্রতি সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করেন। এই জন্য এখানে সৎ পুরুষ ও সতী রমণী পাওয়া দুষ্কর। যত দিন সন্তানের ভার সুরুচি পূর্ণ লোকের হস্তে ন্যস্ত না হইবে, তত দিন মঙ্গলের কোন আশা নাই। যে সন্তান জঘন্য দাস দাসীর করে ন্যস্ত হয়, আমরা সমাজকে বলি, তিনি যেন সে সন্তানের আশা না করেন। আহ! কত দিনে সমাজ, সমাজের এই দোষের কথা বুঝিতে পারিবে।

এক্ষণে আমরা আমির নগরের যুবক দলের কথা কিছু বর্ণন করিব; কুসংসর্গ দোষে আমির নগরের যুবকেরা মহাদোষী। সমস্ত আমির নগরের যুবকদিগের মধ্যে এমন একটী যুবকও পাওয়া দুষ্কর, যিনি সৎ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন। তাহারা সকলেই কুরুচি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। আমির নগরের লোকের এমন অধঃপাতে গিয়াছে যে, তাহারা ইহা দোষ জনক বলিয়া বোধ করে না। এই সকল অনেক

পাপই পিতামাতার দোষের দ্বারা সংঘটিত হয়। কে বলিতে পারে, ইহার ফল কি দাঁড়াইবে? যেরূপ ঘটিতেছে, বিচিত্র নহে যে কালে এটী সাধারণ নিয়ম হইয়া যাইবে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে, তাহা আমির নগরে আর বর্ত্তমান নাই। আমির নগরবাসী মুসলমানগণ অধঃপাতে গিয়াছেন। তাহারা ধ্বংশ সমুদ্র-তটে অবস্থিত। তাহাদের সেই পূর্ব্ব পরিচ্ছদ কৈ? ধর্ম্মানুযায়ী বেশ-ভূষা কৈ? সে জাতীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি কৈ? মুসলমানী ধর্ম্ম-গ্রন্থে স্ত্রী-পরিচ্ছদের জন্য কত কঠিন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ আছে, কত ভীষণ দণ্ডের কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কৈ? সে পবিত্র নিয়মাবলী এখন আর কি এই অনুপযুক্ত মুসলমান-কুল-পাংশুল দিগের দ্বারা সংরক্ষিত হয়? যাহারা ধার্ম্মিক-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বীয় ধর্ম্মের নিয়মাবলী গ্রাহ্য করেনা, সে জাতির শীঘ্র মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

রমণীদিগকে পরপুরুষের অগোচরে রাখিবার জন্য পুনঃ ২ পবিত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিধি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার একটী অক্ষর পর্য্যন্তও এইখানে প্রতিপালিত হয় না। হে জগদ প্রভো! তোমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মস্তফার (দরুদ) অনু-সরণ কারী বলিয়া যাহারা বৃথা গৌরব করেন, তাহাদের মধ্যেও পাপ স্রোত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। হে প্রভো! তোমার সৃষ্ট মানবমণ্ডলী পাপ-পঙ্কে মগ্ন। তাহাদিগকে সে পাপ হইতে উদ্ধার কর, তাহাদের আত্মার সদগতি তুমি ভিন্ন

কে করিতে পারিবে? তোমার অনুগ্রহ না হইলে কাহারও সাধ্য নাই যে, এ সংসারের মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র পথে চলিতে পারে। প্রভো! তুমি তাহাদিগকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার কর। তুমি তাহাদিগকে পাপী ও শ্রেষ্ঠ শয়তানের মায়াজাল ভেদ করিবার শক্তি দাও। তুমি সে শক্তি না দিলে জিতেন্দ্রিয়ই বল, আর মহর্ষিই বল, কাহারও সাধ্য নাই যে, তিনি আর পবিত্র হইতে পারেন। প্রভো! পাপীর পাপ ক্ষমা কর, তুমি দয়াময়!

এহেন আমির নগরের কোনও এক ভদ্র পরিবারে মোহাম্মদ কাসেমের জন্ম হয়। কিন্তু আমির নগরবাসীর মধ্যে তাহার আচার, নীতি ও শিক্ষা-প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল। আমির নগরের যুবকদের সঙ্গে সমূহ অনৈক্য থাকায়, তাহারা সকলেই তাহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে ভাবিত। এমন কি, তাহার আত্মীয় কুটম্বেরা সকলেই তাহাকে পাগল বলিয়া ঘৃণার সহিত হাস্ত করিত। সে সাহসী, উপহাস শ্রবণে সে পরম প্রীত ও পুলকিত হইত; তাহার জীবন-রহস্য সংক্ষেপে অতঃপর বর্ণন করা যাইবে।

৪র্থ প্রতিবিম্ব।

শ্যামাসুন্দরী ভগিনী।

আমির নগরের অতি নিকটেই পার্টোরী নামক গ্রাম অবস্থিত, সেখানে ভদ্রলোক কেহই বাস করেন না; নীচ বংশীয়া হিন্দুই সেখানকার প্রধান অধিবাসী। পার্টোরী গ্রামের কেহই বিশেষ সঙ্গতিশালী নহে। ভূপতি সিংহই তথাকার লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী ক্ষেত্রমণি নাম্নী একমাত্র কন্যা সন্তান আছে। তাহার বিধবা কামিনী, কন্যা সহ বাস করিতেছে। কন্যা বিবাহোচিত বয়স প্রাপ্ত হইলেও, তাহার মাতা একাকিনী বলিয়া তাহাকে বিবাহ দেন নাই। তাহার জননীর বাসনা ছিল, কেহ যদি তাহার কন্যাকে বিবাহ করত, তাহার বাটীতে গৃহ-জামাতা রূপে থাকে, তবে তাহার সহিত ক্ষেত্রের বিবাহ দিবে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন বর যুটিল না বলিয়া, ক্ষেত্রমণি এতদিন অবিবাহিতা রহিয়াছে।

কাসেম সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পার্টোরি গ্রামে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি ভূপতি সিংহের বাটীতেও গমন করত ক্ষেত্রের রূপ-সুধা পানে পরিতৃপ্ত হইতেন। কাসেমের পিতার অবস্থাও বড় মন্দ নহে, সাধারণ ভাবের ছিল। ক্ষেত্রমণির বাটীতে

তিনি যখনই গমন করিতেন, তখনই ক্ষেত্রমণির বাড়ীর সকলে তাঁহার নিতান্ত আদর করিত—বিশেষতঃ ক্ষেত্রের মাতা তাঁহাকে বড় সম্মান করিতেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে এক দৃষ্টে ক্ষেত্রমণির সুধা-বিনিন্দিত চারু বদনমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া থাকি-তেন। সে মুখ চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কাসেমের হৃদয়ে কত কি ভাবান্তর উপস্থিত হইত—মনে কতই আশা ভরসা উপ-স্থিত হইত, তাহা তিনিই জানেন। কে বলিতে পারে যে, তিনি সে মুখ দেখিতে ২ একবারও ভাবেন নাই যে, ক্ষেত্রমণি একবার আমার হইবে। ক্ষেত্রমণিকে আমি আমার বলিয়া জীবন সার্থক করিব। ক্ষেত্রমণির মুখ কমল দেখিতে ২ আমার সময় সুখে অতিবাহিত হইতে থাকিবে।

ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রমণি তাহার হৃদয়ের সুখ ও শান্তির এক মাত্র আধার হইয়া উঠিল। এইরূপ ক্ষেত্রমণি দর্শনে কাসেম অনেক দিন যাপন করিলেন। কাসেম এরূপ অবস্থায়ই রহিলেন।

মানব মনের বৃত্তি সকলের মধ্যে যখন যে বৃত্তি প্রাবল্য প্রাপ্ত হয়, তখন সে বৃত্তির দিকেই মানবের অধিক পরিমাণে ঝোক থাকে, অন্যান্য বৃত্তি সকল শৈথিল্য প্রাপ্ত হয়, উপযুক্ত রূপে অন্যান্য বৃত্তির পরিচালনা হয় না, মাত্র এক বৃত্তিই সম্পূর্ণ রূপে পরিচালনা প্রাপ্ত হয়।

কাসেমের হৃদয়ে এখন প্রেমেরই প্রাধান্য অধিক পরিমাণে, প্রেমই অধিক পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং অন্যান্য বৃত্তির তত-দূর স্ফূর্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না।

এ বৃত্তির এতদূর পরিচালনা হইয়াছে যে, প্রেমই কাসেম-জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য ক্ষেত্রমণিতেই কাসেম-জীবনের একমাত্র সুখ ও শান্তি নিহিত রহিয়াছে; আর কিছুতেই সুখ নাই। ক্ষেত্রমণি দর্শনই যে এখন কাসেমের জীবনের একমাত্র সুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও এই প্রেমের ফল।

কাসেমের প্রেম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এইরূপে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে চলিল; দেখিতে দেখিতে ক্ষেত্রমণিও ১৫ বৎসরে পদার্পণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রমণির রূপরাশি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইল। সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ সম্পূর্ণতার দিকে দৌড়িল। বৃত্তি সকল চরিতার্থ হইতে ছুটিল। পাশ্চাত্য বিদ্বান্ লোকেরা যাহাই বলুন না কেন, আমি বলি, কামিনি গণ ১৫ বৎসর বয়সেই পূর্ণ যুবতী হইয়া থাকে। যদি একথা সত্য হয়, তবে এখন আমরা ক্ষেত্রমণিকে বালিকা বলিয়া সম্বোধন করিব না; তরুণী অভিধানে এখন আমরা তাহাকে অভিহিত করিব।

কাসেমের হৃদয় এখন তরুণীকে কেবল দেখিয়া সুখী নহে। সে আরও অধিক কিছু প্রার্থনা করে। কাসেম এখন কেবল ভালবাসিয়াই সুখী থাকিতে চায় না; তিনি এখন সে চারু-নেত্রা তরুণীর ভালবাসাও পাইতে চায়। মানব হৃদয়ের নিয়মই এইরূপ!

উন্নত হইতে উন্নততর হওয়া, মহৎ হইতে মহত্তর হওয়া

মানব-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কাসেমের মনোমধ্যে আবার চিন্তা বর্দ্ধিত হইল, সে চিন্তা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অনেক নিঃস্বার্থ প্রেমিক আছেন, তাহারা কেবল ভালবাসিয়াই সুখ প্রাপ্ত হন, ভালবাসা পাইলেন কি না—তাহার বড় ধার ধারেন না। এরূপ প্রেমিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কাসেমের প্রণয়—কেবল কাসেমের নহে, জগতের প্রায় সকলেরই প্রণয় অন্য ধরণের। কাসেম যেমন ভালবাসেন, তেমন তরুণী হইতে আশাও করেন। এই চিন্তা এখন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তরুণীর ভালবাসা পাইতে তিনি যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা এখন বিবৃত হইবে।

শ্রীনাথ দেব নামক একজন মধ্যবিৎ গৃহস্থ লোকও পাটোরি গ্রামে বাস করেন। ক্ষেত্রমণিদের বাটীর পার্শ্বেই তাহার বাটী। তাহার অবস্থাও বড় মন্দ নহে; তিনি নিজে ৪০৲ টাকা মাসিক বেতনে নিকটবর্ত্তী চা বাগানে চাকুরি করেন।

উক্ত শ্রীনাথের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী। বর্ত্তমান ঘটনার সময় শ্যামাসুন্দরীর বয়স ১৮ বৎসর। শ্যামাসুন্দরী পূর্ণ যুবতী—স্বভাবতঃই তিনি সুন্দরী; যৌবন আবার সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। শ্যামাসুন্দরীর বর্ণ গৌর, ললাট প্রশস্ত, বদনে স্নেহ ও মমতার আভাস প্রকাশিত। তাঁহার যেরূপ শারীরিক গঠন, গাম্ভীর্য্যও সেরূপ গঠনের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। শ্যামাসুন্দরী ধীরা ও বুদ্ধিমতি। তাঁহার

পতি ২৫ বৎসর বয়স্ক নবীন যুবা পুরুষ। শ্যামা পতিব্রতা, স্বামী সেবায় শ্যামা নিয়ত কায়মনে নিযুক্তা। পতিই তাহার জীবন সর্ব্বস্ব—একমাত্র দেবতা। শ্যামা স্বামী সেবার জন্য পাটৌরি গ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শ্যামা সম্পর্কে ক্ষেত্রমণির জ্যেষ্ঠা ভগিনী, শ্যামা ক্ষেত্রমণির একমাত্র উপদেশ ও পরামর্শদাত্রী সখী ও বন্ধু। ক্ষেত্রমণিও শ্যামার বাটী প্রায় এক খানে—২।৩ বাড়ী মাত্র ব্যবধান। ক্ষেত্র-মণির সহিত শ্যামার সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হয়। তবে শ্যামা, স্বামীর স্ত্রী, সর্ব্বদা ক্ষেত্রমণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষেত্রমণি অনূঢ়া, সে নিরন্তরই শ্যামার বাটিতে গমন করত শ্যামার সঙ্গে নানা প্রকার আলাপ প্রলাপ করে।

কাসেম দেখিলেন যে, যদি তাঁহাকে ক্ষেত্রমণির ভালবাসার আশা করিতে হয়, তবে তাঁহার প্রথমতঃ শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় করা আবশ্যক। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে পূর্ব্বেও তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় ছিল, সুতরাং তিনি শ্যামাকে, ক্ষেত্রমণির ভালবাসা প্রাপ্তির প্রধান সহায় মনে করিয়া, শ্যামার সঙ্গে ধর্ম্মের ভাই-ভগিনী সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে মনন করিলেন; শ্যামাও শ্রবণ করত প্রফুল্লা হইলেন। সকলেই কাসেমকে সৎ ও অমায়িক পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। কাসেমের অমায়িকতায় শ্যামা প্রভৃতি সকলে—এমন কি, কাসেমের একমাত্র সুখ-প্রদা-য়িনী ক্ষেত্রমণি পর্য্যন্ত আপ্যায়িত ছিলেন।

২য়তঃ কাসেম ভদ্র সন্তান, শ্যামা উচ্চবংশীয়া নহেন, সম্বন্ধ

শুনিয়া শ্যামা প্রভৃতি অনেকেই বড় প্রীত হইলেন। শ্যামার স্বামী সময় ২ প্রায় বাটীতে উপস্থিত থাকিতেন না। সেবার তিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনিও সানন্দ চিত্তে এ সম্বন্ধে মত দিলেন।

কাসেম কার্য্য সিদ্ধির প্রথম বারেই সফলতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রায় ২০৲—২৫৲ টাকা ব্যয় করত শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীর জন্য উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি, নানা প্রকার বস্তু ও বহুল পরিমাণে সন্দেশ প্রভৃতি সুখাদ্য ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠাইলেন; ইহাতে শ্যামা প্রভৃতি সকলেই সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। শ্যামা সুন্দরীর স্বামীও তদ্‌হেতু অর্থ ব্যয় করিয়া সৌজন্যোচিত কার্য্য সমাধা করিলেন।

কার্য্য নিষ্পন্ন হইল, শ্যামা অদ্য হইতে কাসেমের ভগিনী হইলেন। কাসেম ভ্রাতা—শ্যামা ভগিনী।

পার্থিব সম্বন্ধের মধ্যে ভাই ভগিনী সম্বন্ধ বড় মিষ্ট, বড় মনোহর। রমণী স্বভাবতঃই পুরুষ হইতে অধিক স্নেহশীলা; ভগ্নীর ভালবাসা ভ্রাতা হইতে অধিকতর—ভগ্নীর ভালবাসা অসীম—সে ভালবাসার তুলনা নাই। জগতে তাহা অপার্থিব ধন। ধর্ম্মের ভাই অথবা ধর্ম্মের ভগিনী অনেক স্থলে স্বীয় ভ্রাতা ভগ্নী অপেক্ষা অধিকতর স্নেহশীল বা স্নেহশীলা হয়। ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেই চারুমন্ত্রে পবিত্র ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান কাসেম ও বিধর্ম্মী শ্রীনাথ বনিতা শ্যামাসুন্দরী উভয়েই দীক্ষিত হইলেন। কে বলিতে পারে, ইহারাও প্রকৃত

ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নীর ন্যায় কার্য্য করিবে না? এরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে অনেক আছে। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে পরস্পর এইরূপ ভ্রাতা ও ভগ্নী সম্বন্ধ—কিম্বা রাখী ভাই-ভগিনী অর্থাৎ বীরা-প্রথা প্রচলিত ছিল।

৫ম প্রতিবিম্ব।

—০—

১ম সম্মিলন।

৪টা বাজিয়াছে, দিনমণি পশ্চিম দিকে হেলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছেন—পূর্ব্ব তেজ আর নাই। মধ্যাহ্নে যে প্রখর তেজে অংশুমালী ভুবন দগ্ধ করিতেছিলেন, হায় রে! এখন আর সে তেজ নাই; এখন তিনি শান্তির আকার ধারণ করিয়াছেন—সে উষ্ণতা আর নাই।

শ্যামাসুন্দরীর বাটীতে নিভৃত কক্ষে পরস্পর পৃথকাসনে বসিয়া দুই জন। সে নিভৃত কক্ষে বোধ হইল উভয়ে কথোপ-কথনে মগ্ন। একটী গম্ভীর পুরুষ মূর্ত্তি ও একটী লজ্জাবতী রমণী মূর্ত্তি। পুরুষটী গম্ভীরভাবে একটী আসনোপরি উপবিষ্ট। তাহার মুখচন্দ্র চিন্তা ও ভাবনায় বিমর্ষ। মনের মধ্যে যেন প্রবল কোলাহল উঠিয়াছে। মনোরাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। কিছুরই শাসন নাই, সম্পূর্ণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। যুবক বিমর্ষ চিত্তে রমণীর প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ

করিয়া রহিয়াছেন। অন্যটী তরুণী, রমণীগণ স্বভাবতঃ লজ্জা-শীলা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক এ রমণী অত্যন্ত লজ্জা-শীলা। তরুণী পৃথকাসনে নিতান্ত বিমর্ষভাবে অধোবদনে লজ্জিতা ও ব্রীড়াবনতা ভাবে উপবিষ্টা। সে চারুনেত্রার নয়ন সরোজ ভূমির দিকে অবনত ; বোধ হয় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যুবক হৃদয়াপেক্ষা ভীষণ ঝটিকা প্রবলতর বেগে উত্থিত হই-তেছে। কোন আভ্যন্তরিক অনিবার্য্য ভাব ব্যতীত আর কিছুই তরুণীকে সেখানে উপবিষ্টা রাখিতে পারে না। তরুণীর মনের মধ্যে কিছুবই স্থিরতা নাই। আকস্মিক কোন ঘটনায় মানবের মন যেরূপ হয়, আজ তাহাই তরুণীর মনে বিরাজ করিতেছে। লজ্জাবনতা হইয়া যেরূপ ভাবে প্রদীপবৎ নিশ্চল নিষ্কম্প ভাবে যুবতী উপবিষ্টা, তাহাতে বোধ হয় গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য একাধারে মিশ্রিত হইয়া যুবতীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ে সম্পূর্ন তুফান বর্ত্তমান। অনেকক্ষণ পরে যুবক অস্পষ্ট স্বরে, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করত বলিলেন——

আমি ত বলিয়াছি, আমার জীবন মন, তোমার করতলে ন্যস্ত। আমি আজি তোমারই সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার এ প্রতিজ্ঞা কিছুতেই টলিবে না ; আমি কখনও ক্ষেত্রমণি ভিন্ন অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিব না। ক্ষেত্র তুমি বলিতেছ তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, কিরূপে প্রেম সম্ভবে ? কিন্তু তুমি প্রেমিকের হৃদয় জান না। প্রিয়ে! জগতে এই মিষ্টতম প্রিয়ে শব্দ প্রয়োগ করিতে যদি ক্ষমতা দাও, তবে বুঝাইতে

চেষ্টা করিব যে, কি বিষে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত। ক্ষেত্র, হৃদয়ের যতদূর সাধ্য, আত্ম সংযম করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু হৃদয় মানে না, তোমার প্রেমের প্রবল বন্যায় চিত্ত সংযমন—বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। চিত্ত সংযমনে অক্ষম হইয়া, আমি তোমারই জন্য—বলিব কি আর—তোমারই জন্য - প্রিয়তমে—শ্যামাসুন্দরী আমার ধর্ম্মের ভগিনী। হৃদয়ের খাদ্যই আশা, মানব-হৃদয় আশা ব্যতীত কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে না। অনেক সহিলে পর দুরাশা জনক কার্য্যও আশাজনক বোধ হয়। আমিও এ দুরাশা জনক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম, দুঃখে কষ্টে যদি আমার শরীর ও মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠে, পৃথিবীতে যেরূপ দুঃখ হয় নাই, আমার সেরূপ যদিও হয়, আর তুমি—মনোমোহিনী মম প্রাণের ক্ষেত্র, একবার ও চকোর নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টি কর, ঈষদ্ধাস্য কর, তবে আমি চরিতার্থ হইব। সকল দুঃখ কষ্টকে সুখ বলিয়া বিবেচনা করিব। দেও তবে কি উত্তর প্রিয়ে ? আমার প্রাণ তোমার হস্তে সমর্পিত, ইচ্ছা হয় তুমি বধ কর, নচেৎ রক্ষা কর।

বাক্য সমাপ্ত হইল, উত্তর প্রত্যাশায় যুবক রমণীর বদন পানে চাহিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কোন উত্তর আসিল না। অবশেষে লজ্জাবনতা রমণী ধীরে অতি ধীরে তান-পুরা বিনিন্দিত স্বরে বলিতে লাগিল ; সে সুমধুর কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ যুবকের হৃদয়ে সুধাধারা প্রবাহিত করত বহির্গত হইতে লাগিল। বোধ হইল, যুবক অতি ব্যগ্র ভাবে তাহার সে

মধুমাখা কথার প্রত্যেক অক্ষরটী পর্য্যন্ত যেন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেছেন।

তরুণী কথা বলিতে চাহে, কিন্তু কে যেন তাহাকে বলিতে দেয় না। অতি কষ্টে তরুণী বলিতে লাগিল, "আপনি অতি ভয়ানক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, পরমেশ্বর জানেন, ইহার অন্তিম ফল কি ফলিবে। মনে করিবেন না যে কেবল আপনিই চিরদুঃখী, আপনার হৃদয়েই অপার কষ্ট; আমার হৃদয়ে কতদূর কষ্ট বিরাজ করিতেছে, তাহা আপনার চিন্তার অতীত। নারী-প্রেম পুরুষের বুঝিবার সাধ্য নাই। আমার হৃদয় যদিও প্রেমাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছিল, কিন্তু আমি এঁত সাবধানে সে অগ্নি গোপনে রাখিয়াছি যে, আপনি ও ঘৃণাক্ষরে তাহা জানিতে পারেন নাই। রমণী-হৃদয়ের বিশেষত্ব এই যে, গোপনে সে বহুকষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। আপনার জন্য যে আমি কতদূর দুঃখে কষ্টে সময় অতিবাহিত করিতেছি, তাহা একমাত্র পরমেশ্বর জানেন। পরন্তু বলিয়া দেই, আপনি মনে করিবেন না যে, আপনার হৃদয় নিহিত প্রেমের বিষয় পূর্ব্বে আমার অগোচর ছিল। অনেক পূর্ব্বে আপনার হৃদয় বুঝিতে পারিয়াছি, অনেক পূর্ব্বে আপনার ভাব ভঙ্গিতেই সব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আপনি আমাদের বাটীতে আসিলেই কেবল আমার সাক্ষাৎ লাভ খুঁজিতেন। আমার সাক্ষাতে আসিলেই যখন আপনি মাতার সঙ্গে আলাপ প্রলাপ করিতেন, তখন আপনি একদৃষ্টে আমার

দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এরূপ শত শত কার্য্যে আমি সব জানিতে পারিয়াছি। আমি এতদিন কাহাকেও আমার হৃদয়ের কথা জানিতে দেই নাই, কিন্তু আজি মুখরার ন্যায় (আপনি মুখরা বলিবেন) আপনাকে সব বলিলাম, আপনি আমার সঙ্গে আলাপের জন্য যেরূপ ব্যস্ত, তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আমি আপনার সহিত আলাপের জন্য ব্যস্ত। আমি জানি, এ সম্মিলন অসম্ভব; আমি জানিতাম, অনবরত তাহা হৃদয়েও পোষণ করিতাম। আমি সে দুর্ব্বিহ কষ্টও সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনার কষ্ট দেখিলে হৃদয় বিদরে; আপনার মর্ম্মান্তিক যাতনা আমার পক্ষে অসহনীয়। জানি আমি এ সম্মিলন অসম্ভব; জানি আমি এ প্রণয়ে কলঙ্ক ও বিষাদ-সিন্ধুতে ঝাপ দিয়াছি; কিন্তু যখন ঝাপ দিয়াছি, তখন প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে সন্তরণ করিতেই হইবে। কিন্তু আপনার ন্যায় সঙ্গী সহ সন্তরণ করিলে বিষাদ-সিন্ধুকেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সমুদ্র মনে করিব। জীবন যায় যাউক, আমার হৃদয় আপনাকে সমর্পণ করিলাম। “আমি আপনার দাসী, আমি আপনার, আমি আর কাহারও নহি, প্রাণাধিক একবার সে মিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করি, প্রাণাধিক, আমি তোমার দাসী, নারীর হৃদয়-মন এক পুরুষে ন্যস্ত, প্রভু আমিও আমার পরম ধন তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তুমি আমার পতি। এ ভব ভবনে তুমি আমার গতি। দেও প্রভু, শ্রীচরণধুলি শিরে প্রদান করত জীবন

সার্থক করিতে দাও। অন্তর্য্যামীকে স্মরণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা হস্তে লইয়া ও শপথ করিলাম, আমি এ জীবনে তোমারই দাসী, অন্য কাহারও নহি। জন্ম জন্মান্তরে যেন ঈশ্বর আপনার প্রণয়-সূত্র হইতে অধিনীকে বিচ্ছিন্ন না করেন।"

এই বলিয়া সে তরুণী আসন পরিত্যাগ করত গজেন্দ্র গমনে পুরুষ প্রবরের আসন পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক, তাহার চারু মৃণাল সদৃশ বাহু লতা পুরুষ চরণে স্থাপন করত, যেমন চরণ ধূলি শিরে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইল, অমনি যুবক পবিত্র প্রেম কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সত্য বলিব—মিথ্যার অণুমাত্রও বলিব না—তরুণীকে আলিঙ্গন করত তাহার বদন চুম্বন করিলেন। তৎক্ষণাৎই যুবক যুবতীর স্থান অবস্থা স্মরণ হইল, উভয়ে লজ্জাতে আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্ষণকাল পরে যুবক বলিলেন, প্রিয়তমে! যাই তবে—স্থান বিপদ-সঙ্কুল; যাই তবে প্রাণের ক্ষেত্র, সময় সময় তব চারু বদন-সরোজ দর্শনে ও তানপুরা বিনিন্দিত সুমিষ্ট বাক্য লহরী শ্রবণে দাস যেন কৃতার্থ হয়, এই বাসনা প্রিয়ে! যুবতী বিমর্ষ বদনে সুমিষ্ট স্বরে উত্তর করিল, "যাও তবে নাথ ভুলোনা দাসীরে।" যুবক দ্বারদেশ পর্য্যন্ত সে সময়ে আসিয়াছেন; নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়াই অদূরে ক্ষেত্রের পিতৃব্য তনয় শ্রীশকে দেখিলেন। শ্রীশ কাসেমকে দেখিবামাত্রই সেলাম করিয়া বলিল, "মহাশয় কোথায় গমন করিয়াছিলেন?"

যুবক বলিলেন, ভগিনী শ্যামাসুন্দরীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। এই বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন। শ্রীশ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক, অবশেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

উক্ত ঘটনা যে দিন সংঘটিত হয়, সেদিন শ্রীনাথের বাটীতে কেহ ছিল না; শ্রীনাথ সে সময় কার্য্যস্থানে ছিলেন; রাত্রি প্রায় দশটার সময় সর্ব্বদাই তিনি কার্য্যস্থান হইতে ফিরিতেন। শ্রীনাথের পিতা মাতা কেহই জীবিত ছিলেন না; তখন পর্য্যন্ত সন্তান সন্ততির মধুর হাস্য ও কোলাহল ধ্বনিতে তাঁহার গৃহ প্রতিধ্বনিত হয় নাই। শ্রীনাথের বাড়ীতে শ্রীনাথ কেবল একাকী থাকিতেন। তাহার ভার্য্যা শ্যামা সুন্দরী একাকিনী থাকা প্রযুক্ত, তিনি একটী দাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দাসীই গৃহের প্রায় সকল কার্য্য সম্পাদন করিত।

শ্যামা সুন্দরীর পিত্রালয় নিকটেই ছিল, তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই বর্ত্তমান ছিলেন।

একদা শ্যামাসুন্দরী স্বীয় পতি শ্রীনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া নিজেও ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; আহারান্তে শ্রীনাথ আলস্য প্রযুক্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; ভার্য্যা শ্যামা আহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শয্যোপরি পতির চরণ দ্বয় ক্রোড়ে ধারণ করত অলস ভাবে শয়ন করিলেন। পতিব্রতা সতীর স্বামী সেবাই পরম সুখ। শ্রীনাথ একদৃষ্টে পতিব্রতা পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টিতে কতই সন্তোষ, কতই

আনন্দ প্রকাশিত হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বদন কমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে শ্রীনাথ বলিলেন, "ধন্য পরমেশ্বর, যিনি এহেন অমূল্য রত্ন এ দরিদ্রকে দান করিয়াছেন। এহেন রত্ন অভাবে ভুবন বিজয়ী মহারাজাও জগতে অসুখী; আবার এহেন রত্নের প্রসাদে দরিদ্রও রাজার ন্যায় সুখী।" এই বলিয়া শ্রীনাথ পত্নীকে সাদরে চুম্বন করত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। স্বামীর কর্ম্মস্থানে গমনোপযুক্ত পোষাক শ্যামা-সুন্দরী সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। শ্রীনাথ বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! আজি কোন্ সময়ে আসা হইবে?" শ্রীনাথ বলিলেন, বোধ হয় আজ অধিক রাত্রি হইবে। সাজ সজ্জা সমাপ্ত হইলে শ্রীনাথ চলিয়া গেলেন; শ্যামা সুন্দরী একদৃষ্টে স্বীয় প্রাণনাথের প্রত্যেক পাদ বিক্ষেপের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ নয়ন-পথ বহির্ভূত হইলে শ্যামা বিমর্ষ চিত্তে বিশ্রামার্থে শয্যায় শয়ন করিলেন; এমন সময় ত্রস্তভাবে এক জন লোক গৃহে প্রবেশ করিল। শ্যামা নয়ন উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, সে তাঁহার পিতার বাড়ীর ভৃত্য। অতি ব্যস্ত দেখিয়া শ্যামা ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংবাদ কি? ভৃত্য গোপাল অতি অস্থির হইয়া বলিল, আপনার ভ্রাতার চক্ষে হঠাৎ অত্যন্ত বেদনা হইয়াছে, বেদনায় অধীর হইয়া শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতে-ছেন; বাটীর সকলেই এজন্য ব্যস্ত ও অস্থির, আপনাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। শুনা

মাত্রই শ্যামা অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন, তাঁহার বদন মণ্ডলের মধুর হাসি বিমর্ষচ্ছায়ায় ঢাকিল; তৎকালে দ্বারদেশে পুনঃ আর একটি মূর্ত্তি দর্শন দিলেন, সে মূর্ত্তি পুরুষ নহে—রমণী; তিনি ক্ষেত্রমণি।

শ্যামা বলিলেন, ভগিনি! আমার ভ্রাতা অত্যন্ত পীড়িত, এখনই আমাকে তথায় যাইতে হইবে।

আমার গৃহ জনশূন্য, দাসীকে আমার সঙ্গে লইতে হইবে। ভগিনি! সেখানে অধিক বিলম্ব হইলেও সন্ধ্যার একটু পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তুমি ততক্ষণ আমার বাড়ীতে বসিয়া থাক, তোমার মাতাকে আমি যাইবার সময় বলিয়া যাইব।

ক্ষেত্রমণি উত্তর করিলেন "আচ্ছা ভগিনী, আমি অপেক্ষা করিব, বাড়ীতে আজ আমার বড় কার্য্যও নাই, এখানে পুস্তক আছে, আমি বসিয়া পাঠ করিব। আমাদের আহার কার্য্য ইতিপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে, আমার মাতাকে বলিয়া যাও?"

অতি ব্যস্ত ও অতি অস্থির হইয়া শ্যামাসুন্দরী শীঘ্রই দাসী সঙ্গে পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন; ক্ষেত্র বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে দুই প্রহর অতীত হইয়া চলিল—ক্রমে ২॥০টা বাজিল—হঠাৎ শ্রীনাথের বাড়ীর দ্বারদেশে শব্দ হইল; দ্বার খোলা হইলে একটী পুরুষ মূর্ত্তি দ্বারদেশে দৃষ্ট হইল। যুবক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগ্নি কি বাটীতে আছেন?

যুবক কাসেম, শ্যামাসুন্দরীর বাটীতে সর্ব্বদাই যেরূপ অবাধে আগমন করিতেন, আজিও সেইরূপ আসিলেন। দ্বার খুলিয়া দর্শন করিলেন—হৃদয়ে যাহার মনোরম মূর্ত্তি অঙ্কিত—সেই ক্ষেত্রমণি সম্মুখে শয্যোপরি উপবিষ্টা ! যুবকের হৃদয়ে তখন কি ভাব উদ্দীপিত হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। যুবক সে ভাব কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসনোপরি বসিয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রও সুন্দররূপে উঠিয়া উপবিষ্টা হইলেন। অতি ধীরে, লজ্জাবনত বদনে, ক্ষেত্র বলিলেন, "তিনি গৃহে নহেন, তাঁহার ভ্রাতা পীড়িত বলিয়া তিনি পিত্রালয়ে গিয়াছেন।" কি মধুর কি মধুর ধ্বনি ! যুবক-হৃদয়ে প্রেম-প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গে তদীয় প্রেম-লতিকা, সেই বিধুমুখী বরাননার প্রথম আলাপ। তৎপর ধীরে ধীরে আলাপ আরম্ভ হইল. পূর্ব্বোল্লিখিত কথোপকথন তখনই সম্পন্ন হইয়াছিল।

সদাশয় পাঠক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য ঘটনা-মূলক ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া আমরা সত্য কথাই লিখিব। কল্পনার পরাকাষ্ঠা এখানে বড় দেখিবেন না। দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক মুসলমান যুবক কাসেম, ও ত্রয়োদশ বর্ষীয়া ক্ষেত্রমণির সম্মিলনে কল্পনার ছায়াও পতিত হয় নাই ; যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অবিকল সেইরূপই লিখিত হইয়াছে—যথাযথ চিত্র এ ক্ষেত্রে চিত্রিত আছে।

প্রিয় পাঠক ! আমরা যখন সত্য ঘটনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন এই উপন্যাসে সর্ব্বাঙ্গীণ খাঁটী ও নির্দ্দোষ এব

সম্পূর্ণ সুরুচি সম্পন্ন ঘটনা পাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ জগতে এমন সমাজ অতি বিরল, যে সমাজে কেবল সুরুচি পূর্ণ ঘটনাই সংঘটিত হয়। তবে আমরা যখন কোন বিশেষ সমাজের সামাজিক অবস্থা চিত্রিত করিতে তুলিকা হস্তে ধারণ করিয়াছি, তখন এই পুস্তকেও কেবল মাত্র সুরুচি পূর্ণ ঘটনা কিম্বা গল্পাং-শের আশা করা যায় না। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, আমরা সাধ্য মতে এই পুস্তককে কুরুচি বর্জ্জিত করিতে চেষ্টা করিব। যদি কিছুতে এ পুস্তক কিছুমাত্র সুরুচি বর্জ্জিত হয়, তবে যেন মনে করেন, ইহা রুচি বহির্ভূত কল্পনার জন্য নহে—সত্য ঘটনা অবলম্বনে এরূপ লিখিত হইয়াছে—ইহা লিখকের দোষ নহে।

৬ষ্ঠ প্রতিবিম্ব।

—o—

মূর্খ-গজপতি।

ক্ষেত্রমণির দেহ-সিন্ধুতে ত্রয়োদশ প্রবাহ চলিয়া যাই-তেছে। চতুর্দ্দশ প্রবাহ সম্মুখে দর্শন দিতেছে। আমরা বলি-য়াছি, ক্ষেত্রমণি এখনও অবিবাহিতা। বিবাহোচিত বয়স প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষেত্রমণি স্বামী প্রাপ্ত হইল না কেন? ক্ষেত্রমণি পতি সহবাসে সুখী হইল না কেন? পূর্ব্বে ইহারও যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষেত্রমণির মাতা, ক্ষেত্রমণি সহ বাস করেন, তাহার এক-মাত্র আদরের কন্যাই ক্ষেত্র। মাতা ক্ষেত্রকে এত ভালবাসেন যে, এক দণ্ডও ক্ষেত্রের অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না। ক্ষেত্রের জননীর নাম সরলা। সরলা প্রৌঢ়া—পঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন ; এখনও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার দেহে যৌবন সৌন্দর্য্যের কিছু না কিছু চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। যৌবনে তিনি যে পরমা সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ; কিন্তু তিনি বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন না। সরলার অত্যন্ত ইচ্ছা যে, তাঁহার কন্যাকে সতত সম্মুখে রাখেন। এজন্য কন্যার বিবাহের দিকে তাহার বড় একটা যত্ন ছিল না।

যে সম্প্রদায়ে বিবাহ নাম মাত্র, কেবল সামাজিক আচারের জন্য অবিবাহিতা রমণীর কৌমার্য্য ঘুচাইয়া, বিবাহিতা বলিয়া অভিহিত করা হয়, যে জাতিতে নারীর প্রতি পুরুষের কি কর্ত্তব্য, সে দিকে একটুও লক্ষ্য নাই, যে জাতিতে বিধবা রমণী দ্বারা কত ব্যভিচার ; কত শত শত ভ্রূণ হত্যা কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে—তথাপি সে দিকে স্বার্থপর পুরুষ দিগের একটু মাত্র দৃষ্টি নাই ; যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার, ভ্রূণ হত্যা দূষণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, সেই নীচ বংশীয়া রমণী সরলা অবলীলা ক্রমে কন্যাকে নাম মাত্র বিবাহ দ্বারা সমাজ সম্মুখে দোষ বিমুক্ত হইতে কৃতসংকল্প হইলেন।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা কাল্পনিক ঔপন্যাসিক কথা নহে ; ইতিহাসে অনুসন্ধান কর, কৌলিন্য-প্রথা ইত্যাদি ও

সামাজিক ঘটনাবলী অনুসন্ধান কর, কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে।

প্রত্যেক জাতির নীচ বংশীয়েরা প্রায়ই বিদ্যাহীন ও অজ্ঞ থাকে; দয়া, দাক্ষিণ্য, সতীত্বের বড় সংবাদ নেয় না। নীচ বংশীয়দের মধ্যে বিবাহ কেবল একটী নাম মাত্র। বিবাহের উদ্দেশ্য ও প্রথা তাহারা বড় একটা অবগত নহে। বিবাহ হইয়া গেল, স্বামীর সঙ্গ মুহূর্ত্তেকের জন্য লাভ করুক আর না করুক, এমন কি স্বামীর মুখ সন্দর্শন পর্য্যন্ত করুক আর না করুক, স্ত্রীগর্ভে যদি সন্তানের জন্ম হয়, ইহাতে কোন দোষ নাই—কোন পাপ নাই। সমাজ দেখিয়া শুনিয়াও তাহা সহ্য করিয়া থাকে।

সরলারও আন্তরিক ইচ্ছা এইরূপ, যদি কোন গুণ শূন্য পুরুষ (গুণ শূন্য না হইলে ভার্য্যার বাটীতে থাকিবে কেন?) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তাহার দ্বারা ক্ষেত্রমণির অবিবাহিতা নামটী ঘুচাইয়া দেওয়া হইবে। অবিবাহিতা নামটী ঘুচিলেই নীচবংশ মধ্যে স্বীয় পতির বিনা সংস্রবেও যদি সন্তানাদি জন্ম গ্রহণ করে, তবে সেই সন্তান, সেই অবিবাহিতা নামটা ঘুচান কারীর সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে। পাঠক ইহাতেই বুঝিতেছেন যে, সন্তানের কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই।

কুরুচি পূর্ণ নীচ বংশীয়া সরলারও বিবাহ সম্বন্ধে এই মত। নতুবা ক্ষেত্রমণিকে যদি স্বামীর বাটীতে দেওয়া হইত, তবে

অনেকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইত সন্দেহ নাই। হায় দুঃখ! এ উনবিংশ শতাব্দীতে বিবাহের আধ্যাত্মিক মতের দিকে অনেকেরই লক্ষ্য নাই।

ক্ষেত্রমণির বয়ঃক্রমের ত্রয়োদশ বর্ষ চলিয়া গেল, এ পর্য্যন্তও অবিবাহিতা নামটী ঘুচিল না। কি পরিতাপ! অনু-সন্ধান করিলেন, বর পাওয়া যায় না।

অদ্যকার বৈকাল বেলা বড়ই মনোরম; সূর্য্যতেজ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, পৃথিবী শীতল হইতে চলিয়াছে। মৃদুল হিল্লোলে বৃক্ষ পত্র শন্ শন্ করিতেছে, তাহা বড় সুন্দর—বড় মধুর! সুগায়ক বিহঙ্গম ভূতলে থাকিয়া যেন স্বর্গীয় তান, স্বর্গীয় গান অপহরণ করত ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে অমৃত ছড়াই-তেছে, আর উৎকণ্ঠা পূর্ণ চিত্তের উৎকণ্ঠা দূর করিতেছে: জগতে সুধার ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। অহঃ কি সুন্দর! কি মধুর! প্রকৃতি নীরব, লোকের সাড়া শব্দ নাই; সন্ধ্যা-দেবী নীলাম্বরে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পথিক গণকে আশ্রয় প্রদানার্থে স্ব স্ব গন্তব্য পথের দিকে ঘন ঘন ইঙ্গিত করিতেছেন; এহেন কালে পার্টোরি গ্রামের পার্শ্বদেশে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। বর্ণ গৌর, আকার খর্ব্ব, বয়স ৩০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, ধীরে ধীরে লোকটী বিমর্ষভাবে পাদবিক্ষেপ করি-তেছে, নেত্রদ্বয় কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, মাতালের ন্যায় হালু ঢুলু হইয়া বিমর্ষভাবে চলিতেছে; দেখিলেই তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়।

পথিক দেব বংশজাত, নাম গজপতি ; সে তীর্থস্থানে যাইতেছে। সঙ্গে আরো অনেক যাত্রী ছিল, পার্টোরি গ্রামের পার্শ্বে সন্ধ্যা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সঙ্গীয় অন্যান্য যাত্রী পার্টোরি গ্রামের অন্যান্য বাড়ীতে আশ্রয় লইল, সে (গজপতি) ক্লান্ত ছিল, সুতরাং ধীরে দুর্ব্বল পাদবিক্ষেপের সহিত একাকী—মৃত ভূপতি সিংহের বাটির সম্মুখে আসিল। শ্রীশচন্দ্রও সেই বাটীতে থাকে, যুবক রাত্রে অন্যত্র থাকিবার কোন বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া এই বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিল।

এদিকে ক্ষেত্রের মাতা, কন্যার বিবাহের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া রহিয়াছেন। যুবক গজপতি তাহার আগারেই প্রথম দর্শন দিল। সরলা বসিতে আসন প্রদান করত অতি সমাদরে তাহাকে বসাইলেন ; উভয়ে অনেকক্ষণ আলাপ প্রলাপ হইল। যুবকের বংশ, গোত্র, কুলাদি সমস্তই সরলা জ্ঞাত হইলেন। সরলার মনে ইচ্ছা হইল যে, পথিক দরিদ্র সন্তান, নিজে "ধনী" এই লোভ পরবশ করাইয়া ইহার দ্বারাই কন্যার অবিবাহিতা নামটী ঘুচাইয়া দেন। সরলা নানা কথার ছন্দে বন্দে স্বীয় বাসনা আগন্তুককে অবগত করাইলেন, গজপতি সরলার মনের কথা বুঝিল, সে সরলার কথায় ও প্রলোভন বাক্যে সম্মত হইল। স্থির হইল, গজপতির সঙ্গেই ক্ষেত্রমণির বিবাহ হইবে। পার্টোরি গ্রামের শুক্লপক্ষ সৌহাস্য যামিনী, কৃষ্ণপক্ষচ্ছায়া আসিয়া আচ্ছাদন করিল। আহা কি বিড়ম্বনা ! !

এদিকে কাসেম, প্রিয়া ক্ষেত্রমণি সহ সময় সময় সুযোগ মতে সাক্ষাৎ করেন। প্রদোষকালে অথবা চন্দ্রমাকিরণ উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নাময়ী মনোহর রজনীতে, ক্ষেত্রমণির বাটীর নিকটেই, প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাৎ হইত; এবং কোন দূত দ্বারা উভয়ের মানসিক কথা উভয়ে জানিতে সক্ষম হইতেন। ক্ষেত্রের বিবাহ যদি হয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও স্থিরীকৃত হইল। পাঠক তাহা সময়ে জানিতে পারিবেন।

এদিকে অর্থগৃধ্নু পুরোহিত সরলার দ্বারদেশে আসিয়া দর্শন দিলেন—লগ্ন সুস্থির হইল; বিবাহের দিন, সময়, ঘণ্টা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

পাঠক, এদিকে ক্ষেত্র কুৎসিত নীচাশয় ও ঘৃণার্হ গজপতির সঙ্গে তাহার বিবাহ-কথা শ্রবণ করিয়া কি ভাবিলেন ও কি করিলেন?

ক্ষেত্রমণি সৌম্য মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, ধৈর্য্য তাহার মুখমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ধীরে—অতি ধীরে স্বকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন, এদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই, তিনি যেন এসব দেখিয়াও দেখিতেছেন না। অথচ প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক ঘটনা, মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি করিতেছেন। হৃদয়ে অথবা মুখমণ্ডলে বিমর্ষতা বা আকুলতার কিছু মাত্র চিহ্নও নাই। ক্ষেত্রমণি এক্ষণে গম্ভীর, ক্ষেত্রমণি যে গজপতির রূপ দর্শন করেন নাই, একথাও বলিতে পারিবেন না। কারণ গজপতি যখন সরলার গৃহে আসিতেন, তখন যদি কোন

সূক্ষ্মদর্শী লোক উপস্থিত থাকিতেন ও মনোযোগের সহিত ক্ষেত্রমণির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন, ক্ষেত্র গোপনে ঘোমটার ভিতর হইতে এক-দৃষ্টে গজপতির মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আছেন; সে দৃষ্টিতে কোন আনন্দ প্রকাশের আভাস নাই, বরঞ্চ অত্যন্ত ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

গজপতির মূর্ত্তি দেখিয়া ও কুৎসিতাকার গজপতির সঙ্গে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা ক্ষেত্রমণির বিবাহের কথা ভাবিয়া অনেকেই দুঃখিত হইতেন ও বলিতেন, এমন স্বর্গীয়া সুষমা—হায় এ নরাকার দৈত্যের হস্তে পতিত হইবে?

গজপতি এ সম্বন্ধের পর আর তীর্থে গমন করিল না। সে সরলার বাটীতেই ভাবী গৃহ-জামাতা রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সে এখন অতি অনিন্দিত, মুখমণ্ডল তাহার প্রফুল্ল। সে ক্ষেত্রমণির সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিভোর হইয়াছে। রূপ-তৃষ্ণা তাহার অনুর্ব্বর শুষ্ক হৃদয়েও জাগরিত হইয়াছে। ভুবন মোহিনী ক্ষেত্রমণি তাহার করতলে ন্যস্ত হইবে, এ চিন্তা করিতে করিতে সে অত্যন্ত সুখী হইল। যেরূপ চিন্তায় প্রত্যেক মানব হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় সুখ উপস্থিত হয়, গজপতি সেরূপ অতুলনীয় সুখ লাভ করিতে লাগিল। সে জানিল, ক্ষেত্রমণি-রূপ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা আর কাহারও নহে, সে তাহারই; এই চিন্তায় গজপতি মত্ত ও আত্ম-বিস্মৃত হইল। গজপতির সুখ চিন্তার ইয়ত্তা নাই, অনবরত সে সুখ চিন্তা

করিতেছে। তাহার তীর্থযাত্রা সরলার গৃহেই পর্য্যবসিত হইল।

সুখ চিন্তা করা—সুখ জনক চিন্তায় অনবরত নিমগ্ন থাকা, মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এরূপ লোক অতি বিরল, যিনি সুখ চিন্তা না করিয়া অনবরত কেবল দুঃখ চিন্তা করেন। এরূপ লোক যিনি, তিনিই ভয়ানক বিমর্ষ রূপ (Hypochondria or meloncholy) পীড়া দ্বারা আক্রান্ত; জগতে তাহার সুখের আশা করা বৃথা, সুখ প্রাপ্ত হওয়া তাহার ভাগ্যেই নাই। বিমর্ষতা রূপ পীড়া দ্বারা যিনি আক্রান্ত, সংসারের কোন কর্ম্ম তাহার দ্বারা সম্পাদিত হয় না। ইতিহাস আলোচনা কর, এইরূপ অনেক লোকের সাক্ষাৎ পাইবে। কাউপার, ক্লাইভ প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে বিমর্ষতা পীড়ার ফল স্বরূপ দেখিতে সক্ষম হইবে।

সুখ চিন্তা করাই যদি মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তবে গজপতির চরিত্রে আমরা ইহার ব্যত্যয় দেখিব কেন? গজপতিও মানব, সে তাহার সুখচিন্তা করিতেছে।

সুখের মূল ধর্ম্ম; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ধর্ম্ম ব্যতীত মানবের কিছুতেই প্রকৃত সুখ লাভ হইতে পারে না। যে সুখ ধর্ম্মের সাহায্যে সৃষ্ট হয় নাই, সাবধান! সে সুখের দিকে মোহ মদে মত্ত হইয়া ধাবিত হইও না। সে সুখ সুখ নহে—দুঃখ হইতেও ভয়ানক।

পাপী লোকের অধঃপাতের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে

জ্ঞানিগণ এই সুখই তাহার মূল দেশে দেখিতে পান; বাস্ত-বিক এ প্রকার সুখই পাপী লোকের অধঃপাতের প্রথম ও প্রধান কারণ।

ঘোর রজনী, চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, গগনে শশধর তারকা কিছুই নাই, মহা ঝড় আরম্ভ হইয়াছে, প্রকৃতি যেন ভীম গর্জ্জন করিতেছে, ঝড়ের প্রকোপে সংসারে যেন মহা প্রলয় উপস্থিত হইতেছে, সে সময়ে পথিক নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়; সৌদামিনী ক্ষণস্থায়ী আলো বিকীর্ণ করিল, পথি-কের নয়নকে মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন শক্তি প্রদান করিল। প্রকৃতি মুহূর্ত্তের জন্য পথিক নয়নে ঝলসিল। ঐ যে সৌদামিনী অন্ত-র্হিত হইল, পৃথিবী আবার অন্ধকারে পরিপূরিত হইল, পথিকের কি অবস্থা হইল? সৌদামিনী সহযোগে পথিকের কোন সাহা-য্যই হয় নাই। বরঞ্চ পথিকের যে একটু দর্শন শক্তি ছিল, এই বিদ্যুৎ গমন কালে তাহাও নিয়া গিয়াছে। পাঠক, পথি-কের দুর্দ্দশা দেখিলেন? পাপী-হৃদয়ে এরূপ অন্ধকার বিরাজ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে পাপ চিন্তার প্রবল বেগ প্রযুক্ত হৃদয়ে যেন মহা ঝড় উঠিয়াছে। হৃদয়ের প্রধান নেত্র স্বরূপ বিবেক্-রত্ন; সে বিবেকের কিছুই শক্তি নাই; সে দুরূহ পাপ-রাশি ভেদ করিতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই।

বিবেক দেখিতেছে চতুর্দ্দিকে পাপ—অনন্ত পাপ। হঠাৎ পাপী-হৃদয়ে কোন পাপ-চিন্তা সম্ভূত, কিম্বা কোন পাপ কার্য্য সম্ভূত ইন্দ্রিয়-সুখ প্রবেশ করিলে বিদ্যুতের সেই ক্ষণস্থায়ী

আলোকের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য যেন সে অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হইল—সে ক্ষণস্থায়ী সুখ আবার চলিয়া গেল। হৃদয়ের কি হইল খুজিয়া দেখ। বিবেকের যে বিবেচনাশক্তি-টুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এবার অপহৃত হইয়াছে। সংসারে এমন সুখের অর্থ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মজ সুখকে এখন সুখ বলা যায় না। বিলাসজ সুখ যাহা, তাহাই আধুনিক মতে প্রকৃত সুখ। হায় পরিতাপ!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে বৃত্তির অধিক পরিচালনা করা যায়, সেই দিকেই মানবের মনের গতি প্রবল থাকে।

যখন কোন এক চিন্তায় মানব-মন নিমগ্ন থাকে, এবং সর্ব্বদা সে কার্য্য সিদ্ধির কথা মানব চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তখন মানবের বোধ হয় যেন তাহার জীবনের সুখ এই এক কার্য্যে সরলতার উপরে নির্ভর করিতেছে। সে কার্য্য সফল করিবার জন্য মানব অতি ব্যস্ত হয়; মনে করে সে কার্য্য সফল হইলে সে স্বর্গীয় সুখ লাভ করিবে। কিন্তু কার্য্য সফল না হইলে সে নৈরাশ্য বড় ভয়ানক—সে চোট অসহনীয়। অনেকে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া জীবনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। অনেকে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বুদ্ধি শূন্য হইয়া পাগলের ন্যায় নগরে নগরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়াছেন ও ঘুরিতেছেন।

চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়স্ক গজপতি, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ক্ষেত্রমণির পাণি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, আনন্দ তাহার শরীরে আর ধরে না।

লগ্ন সুস্থির হইয়াছে, বিবাহের দিন ক্রমশঃ নিকটে আসি-তেছে, গজপতির আনন্দ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এসব পরিবর্ত্তনে কিন্তু ক্ষেত্রমণির ভাব ভঙ্গির কোনই পরিবর্ত্তন হই-তেছে না; ক্ষেত্রমণি এসব দেখিয়া শুনিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় স্থির, ধীর গম্ভীর।

ঈশ্বর জানেন, ক্ষেত্রমণি কি ভাবিয়া বসিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এখনও কি সে বদনকমলে বিরাজ করিতেছে? সে ভুবনমোহিনীর মুখচন্দ্রে গাম্ভীর্য্যের ছায়া কি এখনও পতিত রহিয়াছে? সরলা বলিল, অবলা কি এত অল্প বয়সে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে? নব যুবতীর পক্ষে গাম্ভীর্য্য মঙ্গল জনক চিহ্ন নহে।

ক্রমে ক্রমে বিবাহের দিন নিকটে আসিল। যথোপযুক্ত আড়ম্বরের সহিত চল্লিশ বৎসর বয়স্ক গজপতি, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া মনোমোহিনী ক্ষেত্রমণির পাণি গ্রহণ করিলেন। সে সময় কার্য্য সিদ্ধির জন্য গজপতির হর্ষ প্রফুল্ল মুখ ও ক্ষেত্রমণির ঈদৃশ ঘৃণা-সূচক গাম্ভীর্য্য প্রকাশক বদন মণ্ডল দৃষ্ট হইল। ক্ষেত্রমণি কাসেমের সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা তবে কি ভঙ্গ হইল? রমণী ক্ষেত্রমণি তবে কি অসতী হইতে চলিল? আমরা কিছু বলিবনা, পাঠক তাহার বিচার করুন। সৎপথে আমরা দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালাইতে থাকিব, নৌকার গতির কথা যিনি ভাবিবেন তিনি ভাবুন, আমরা কিন্তু যথা সাধ্য দাঁড় টানিয়া যাইব। আমরা সে বাসর-সজ্জার

আড়ম্বাদি বর্ণনা করিব না—রহস্যালাপের অণুমাত্রও বর্ণনা করিব না। স্থূল কথা আমরা সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া যাইব।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে, উপহাস কারিণী পাপিষ্ঠা রমণীর দল ব্যঙ্গ করিতে ২ চলিয়া গিয়াছেন। গৃহ নির্জ্জন—নরবাক্য শূন্য ; মাত্র সেই গৃহে দুই জন। গজপতি ও ক্ষেত্রমণি।

গজপতির হর্ষ ও প্রফুল্লতার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হই-য়াছে ; সিদ্ধকাম হওয়ায় সে তাহার একমাত্র জীবনের আশ্রয় সুরা দেবীর পূজা করিতে বসিল। সুরার বোতল হইতে সুরা ঢালিয়া পান করিল। সুরা পানে মত্ত হওয়াতে, চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রমণীর ধমনীতে শতগুণে কালানল প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। গজপতি পৃথক্ আসনোপরি বসিয়া একার্য্য করিতেছে।

ক্ষেত্রমণি শয্যোপরে পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে উপবিষ্টা—ঘৃণা ব্যঞ্জক কটাক্ষ দ্বারা গজপতির ঘৃণিত কার্য্য কলাপ দর্শন করি-তেছেন। তিনি দেখিলেন, গজপতি স্থান হইতে উঠিল।

গজপতি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সরোষে ক্ষেত্র-মণির দিকে ধাবিত হইল। গজপতি মদ্যপ—নেশায় বুদ্ধি শূন্য হইয়াছে। শয্যোপরি উঠিবা মাত্র সে ক্ষেত্রমণিকে ধরিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিল। ক্ষেত্রমণি ঘৃণার সহিত স্বীয় রাঙ্গা পদ্ম দ্বারা গজপতিকে পদাঘাত করত (লায়লি-মজনুর পাঠক

নিকট ইহা নূতন নহে) দূরে ফেলিয়া দিলেন। মদ্যপ গজপতি পালঙ্ক হইতে পড়িয়া গেল। মদের তেজ তখনও তাহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

ঠিক সেই সময় ক্ষেত্রমণি শয্যা হইতে উঠিলেন। বাসর-প্রকোষ্ঠের নিকটে আরো একটা শূন্য প্রকোষ্ঠ ছিল, ভিতরের দ্বার দিয়া সে প্রকোষ্ঠে যাওয়া যাইত। ক্ষেত্রমণি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ও ভিতর দিক দিয়া দ্বারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন। সেখানে পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত মতে শয্যা বিস্তৃত করা গিয়াছিল, ক্ষেত্রমণি কোমল শরীরে অনেক কাজ করিয়াছেন, ক্লান্তি বোধ করিলেন; এক্ষণে শয্যোপরি গা ঢালিয়া দিয়া, সে সোণার ক্ষেত্র নিদ্রা দেবীর কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলেন।

এদিকে মদ্যপও এই অবস্থায় পালঙ্কের নীচে মদের ঘোরে মত্ত ও স্পন্দহীন হইয়া শুইয়া পড়িল। প্রভাত হইবা মাত্র ক্ষেত্র আসিয়া সে প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া মদ্যপকে টানিয়া শয্যোপরি শয়ন করাইলেন এবং নিজে তৎপার্শ্বে বসিয়া রহি-লেন। আবার সেই গাম্ভীর্য্য বদনে বিরাজ করিতেছে। প্রাভাতিক পবন যখন শন্ শন্ রবে বহিতে লাগিল, ধীরা ক্ষেত্র গজপতিকে জাগরিত করিল। মদ্যপের মদের নেশাটা একটু কমিয়াছে, সুতরাং সে উঠিল। সে সমস্ত নিশি ক্ষেত্র সহবাসে বাস করিয়াছে, এই তাহার বিশ্বাস; অতঃপর ঢুলু ঢুলু নেত্রে সে বাহিরে গেল।

৭ম প্রতিবিম্ব।

—০—

পুনঃ সম্মিলন।

ভাদ্র মাস, পূর্ণিমা রজনী। শরচ্চন্দ্র গগন মণ্ডলে উদিত হইয়া জগতে সুধাময় কিরণ বিতরণ করত, জগৎস্রষ্টা বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিতেছে। পরমেশ্বরের সকল গুণ গান যেন সে চন্দ্রমাতে লিখিত আছে। শশধর সহৃদয় লোকের হৃদয়ে প্রভু-মাহাত্ম্য, প্রভু-প্রেম, প্রভুভক্তি জাগরিত করিয়া দিতেছে। পাঠক, পবিত্র শবে-মেয়রাজের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক করুন, সুধাকরের সুধাময় গুণ-গরিমা সহজেই হৃদয়-ঙ্গম হইবে।

স্বভাব-প্রিয় কবি দেখিবেন, জগতে সুধার অপূর্ব্ব ধারা প্রবাহিত হইতেছে, এবং তিনি সুধা-মত্ত হইয়া চকোরবৎ সেই সুধা পান করিতেছেন।

দেখিবেন—চন্দ্র প্রত্যেক বাটীতে প্রবেশ করত পুরাকালীন ধর্ম্ম প্রচারকগণের ন্যায় অপূর্ব্ব অশ্রুত ভাবে প্রভু-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

হে সুধাকর, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। আমার সমস্ত প্রেম চন্দ্র হে তোমার প্রতি স্থাপিত। তোমাকে আমি যেরূপ ভালবাসি, পৃথিবীতে আর কাহাকেও তদ্রূপ ভালবাসি না।

তোমার মনোহর নয়ন তৃপ্তিকর রূপ যখন আমি সন্দর্শন করি, তখনই আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকে পূর্ণিত হয়; হৃদয়ের প্রদীপ শত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া নয়ন যুগল হইতে অনবরত প্রেম-অশ্রু বিগলিত হইতে থাকে; তৎসঙ্গে সঙ্গে মানসিক মলিনতার ও জড়তার হ্রাসত্ব ও শীতলত্ব অনুভব করিয়া থাকি। হে নীলাকাশের প্রস্ফুটিত কমল! একবার গগন ছাড়িয়া আমার হৃদয়াকাশে আসিয়া বিকাশিত হও। তোমার সুস্নিগ্ধ কিরণ যখন ধরাধামে উদ্ভাসিত হইয়া নিস্তব্ধ বৃক্ষাবলী, বন, উপবন, গ্রাম, নগর, নদী, শৈল ও ভীষণ দর্শন মরুভূমিকে মোহনীয় বেশে সজ্জিত করে, তখন আমি দেখিতে পাই যে, তাহাতে শুধু তোমারই চারু কার্য্য ঘোষিত হইতেছে। মনুষ্য সকল নিদ্রিত রহিয়াছে, তাহারা নির্জ্জীব—মৃতপ্রায় শায়িত; তোমার রৌপ্য মণ্ডিত সুস্নিগ্ধ কিরণ তাহাদের উপর শবাচ্ছাদনের কার্য্য সমাধা করিতেছে; কিন্তু ভাবুক তদ্‌বিপরীত। আমি একাকী নির্জ্জনে বৃক্ষতলে বসিয়া কেবল তোমার রূপ-সুধা পান করিয়া ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনা করিয়া থাকি। শশধর! তোমার রূপ-সুধা পানে নিরীক্ষণ করিলে, আমার হৃদয়ের ক্ষত শতাধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং তদ্ধেতু অধীর হইয়া ক্ষত হৃদয়কে নয়নাশ্রু দ্বারা ধৌত করি। হে সুধাংশু! আমি প্রার্থনা করি, আমার হৃদয়ের এই আঘাত যেন কিছুতে বিদূরিত না হয়; কেননা ইহাতে আমি অপূর্ব্ব সুখানুভব করিয়া থাকি। এই আঘাত আমার হৃদয়ে না থাকিলে বোধ

হয় আমার আত্মাও তমঃপাশে আচ্ছাদিত হইত। হে চন্দ্র! তোমাকে কত জনা এই অবনীতে চিনিয়াছে? তোমাকে যে চিনিয়াছে, তাহাকে উদ্দেশ করিতে হইলে, পূর্ণিমা রজনীতে— ঘোর নিশা কালে নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে বা বৃক্ষতলে খুজিলে তাহার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার পাপ তাপ অপহারক, তুমি আমার হৃদয়ে প্রভু ভক্তি উত্তেজিত করিয়া দাও। চন্দ্র, যখন তুমি গগন মণ্ডলে উদিত হও, তখন আমি কিরূপ আনন্দিত হই—জড় পদার্থ তুমি, তাহা কি বুঝিবে—অথবা তোমারও বোধ হয় অপূর্ব্ব শক্তি আছে, যাহাতে তুমি তাহাও জানিতে পার। যদি তুমি দেখিতে পার, তবে দেখিবে মদীয় চক্ষু অনবরত তোমার উপরে স্থাপিত। চন্দ্র, আমার হৃদয়ের ভালবাসা কত গভীর, যদি তুমি জান; তবে আমি অনুরোধ করি, প্রভু-প্রেম আমার হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দাও। চন্দ্র, আমি তোমাকেই আমার গুরু পদে অধিষ্ঠিত করিয়া দিব। তুমি আমার পবিত্র গুরু হও। তোমার নিকট হইতে আমি পবিত্র দীক্ষা মন্ত্র শিক্ষা করিব। তুমি চন্দ্র, চতুর্দ্দিকে বিভু কৌশল প্রকাশ করিতেছে, তুমি মানব হইত ঈশ্বরের অতি নিকট, তুমিই আমার গুরু, চন্দ্র একবার প্রভু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর, শিষ্যের কর্ণ পরিতৃপ্ত হউক, যাই তবে গুরো!

পূর্ণিমা রজনীতে কোন এক বাটীর বহির্ভাগের পার্শ্বস্থ জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী সমতল ভূমিতে বসিয়া দুই জন মানব কথোপকথনে মগ্ন; একটী যুবক অপরটী যুবতী।

যুবক অমল-ধবল পরিচ্ছদ পরিধান করত ধরাসনে বসিয়া রহিয়াছেন; অতি নিকটে একটী রমণী মূর্ত্তি উপবিষ্টা। রমণী সুন্দরী। প্রাচীন কবি হইলে বলিতেন, রমণীর সুন্দর বদন-মণ্ডল দৃষ্টি করত শশধর মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। যদিও চন্দ্র সে সময়ে লুক্কায়িত না হইতেন, তথাপি প্রাচীন কবি বলিতেন, লজ্জা ভয়ে শশধর লুক্কায়িত হইলেন।

আকাশ আজ গাঢ় নীল পোষাক পরিধান করিয়াছে; মেঘের লেশ মাত্রও নাই। সে নীল চন্দ্রাতপের নীচে বসিয়া পূর্ব্ব কথিত যুবক যুবতী কথোপকথনে মগ্ন!

তানপুরার সুমিষ্ট ঝঙ্কারের ন্যায় সুললিত স্বরে মানবী—পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী বলিলেন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, তুমি আমাকে এত বলিতেছ কেন? তুমি কি এখনও আমায় অবিশ্বাস কর? বহুদিন হইল আমি সে দুষ্ট দুরাত্মাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। বিশ্বাস ঘাতিনী হইলে কেন তাহাকে তাড়াইব? সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। নাথ, তোমার প্রেমে পতিত হইয়া কলঙ্কিনী বলিয়া আমার নাম বিঘোষিত হইতেছে। আত্মীয় পরিজনেরা সকলেই এ গুপ্ত প্রেম-তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে। বলি নাথ, তথাপি দাসী এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিতা নহে, বল প্রাণপ্রিয়, তবুও কি আমায় অবিশ্বাস কর?

তানপুরা ধ্বনি থামিয়া গেল, রমণী স্বীয় বক্তব্য সমাপ্ত করত উত্তর প্রত্যাশায় যুবকের বদন পানে তাকাইয়া রহিলেন।

যুবক বলিলেন—তোমাকে অবিশ্বাস করিব? তোমাকে অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়। প্রাণ ক্ষেত্র, তুমি আমার হৃদয়ের কথা অবগত আছ, বলিব আর কি প্রিয়ে!

ক্ষেত্র—সে কথা, সে কথা প্রিয়তম!—জানি আমি নাথ, তোমার সহিত আমার অহরহ সাক্ষাৎ না হইলে জীবন বিষময় হইয়া যায়। জানি আমি, তোমার ধর্ম্ম পরিগ্রহ না করিলে তোমার সঙ্গে অহরহ সাক্ষাৎ হইবে না। নাথ, তুমি আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে কয়েক খানি বহি দিয়াছিলে, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। ইস্‌লাম ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য—ও দেব দেবীর পূজার অসারতা নির্দ্দেশক সুযুক্তি পূর্ণ পুস্তকাবলী পাঠ করিয়াছি। বুঝিয়াছি, ইস্‌লাম ধর্ম্মই সত্য; দেব দেবীর পূজা মিথ্যা ও অসভ্যোচিত। আন্তরিক মুসলমান ত আমি অগ্রেই হইয়াছি। তোমার শাস্ত্রেই ত নাথ বিধান আছে, যে জন প্রকাশ্যে কাফের (বিধর্ম্মী) ও অন্তরে মুসলমান, সে মানবের নিকট কাফের ও প্রভুর নিকট মুসলমান।

যুবক—কি করিবে তবে প্রিয়তমে?

ক্ষেত্র—মাতা আমার অতি বৃদ্ধা, পীড়িতা—সেবা শুশ্রূষা করিতে আর কেহই নাই; বোধ হয় শীঘ্রই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইবেন। এখন এ অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার মৃত্যুর পরক্ষণেই নাথ, আমার অন্তরে ত আছেই—মুসলমান হইব। নাথের সম্মতির জন্য দাসী অপেক্ষা করিতেছে।

যুবক—প্রিয়ে, ধন্য তোমার মাতৃভক্তি! আর শতবার ধন্য তোমার বিবেচনা শক্তিকে! তোমার ইচ্ছায় আমি কি কভু বাধা দিতে পারি? তোমার যাহা বাসনা, তাহা কর। কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্র, এক মুহূর্ত্ত তোমার অদর্শনে আমার জীবন বিষময় হইয়া উঠে। দুঃখে শোকে জীবন জর্জ্জরিত হইয়া যায়। প্রিয়ে, তোমার এই চারু সুদীর্ঘ কেশের এক গুচ্ছ কি আমায় কর্ত্তন করিয়া দিতে পার?

ক্ষেত্র—সুমধুর হাস্যে হাসিয়া বলিলেন, নাথ! দাসীর কেশ দ্বারা কোনও মন্ত্র বলে আমাকে তোমার দাসী করিতে কি প্রয়াস পাইয়াছ? বিনা মন্ত্র বলে আমি তব দাসী, তব মোহিনী মন্ত্র জীবনে আমাকে ত্যাগ করিবে না। মন্ত্রের আর আবশ্যক কি নাথ!

যুবক—না প্রিয়ে তাহা নয়, তোমার হৃদয় আমি সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছি। তব অদর্শন-ক্লেশ এক মুহূর্ত্তও আমার সহ্য হয় না। এক গুচ্ছ কেশ কাটিয়া দাও, সময় ২ তাহা দেখিয়া ও তদাঘ্রাণ মস্তিষ্কে গ্রহণ করিয়া, আমার তাপিত ও ব্যাকুল প্রাণকে কথঞ্চিৎ শান্ত ও শীতল করিব।

ক্ষেত্র—আচ্ছা তাই হোক্, কাঁচি কোথায় পাব প্রিয়তম, সঙ্গে ত আনি নাই।

যুবক পকেট হইতে এক খানি কাঁচি বহির্গত করিয়া "এই নেও" বলিয়া যুবতীর হস্তে প্রদান করিলেন। রমণী কাঁচি খানিকে চুম্বন করত উহা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পুলকিতান্তরে, সে সুন্দর

গাঢ় কৃষ্ণ কেশরাশি হইতে এক গুচ্ছ কেশ কর্ত্তন করিয়া সহাস্যে যুবকের পদতলে রাখিলেন। যুবক সে কেশগুচ্ছ হস্তে লইয়া মহা সমাদরে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বস্ত্রে জড়াইয়া উহা বক্ষোপরি বাঁধিয়া রাখিলেন।

বহুক্ষণ প্রেমিক-প্রেমিকা নীরব হইয়া রহিলেন। প্রেমিকা বহুক্ষণ পরে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করত কহিলেন, অনেক বিলম্ব হয়েছে প্রিয়তম, লোকে সন্দেহ করিবে, যাই তবে নাথ! দাসী যেন নাথের সাক্ষাৎ অনুক্ষণ লাভ করে।

"যাও তবে প্রিয়ে বিদায় এখন" বলিয়া যুবক যুবতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, যাও তবে প্রিয়ে! যুবতী চলিয়া গেলে, যুবকও অপর দিক দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৮ম প্রতিবিম্ব।

প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমিকা।

কাসেমের প্রেম গভীর—অতি গভীর; প্রেমের সীমা নাই, তাহা অসীম। প্রণয়িনীর রূপ দর্শনই কেবল কাসেমের আকাঙ্ক্ষা, সে পবিত্র বদন দর্শন পর্য্যন্তই সে প্রেমের শেষ সীমা। এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নব যুবক ও নব যুবতী পরস্পর প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া কখনও পাপে মগ্ন হঁন নাই। নব যুবক শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি যখন ক্ষেত্রমণির সম্মুখে গমন

করিতেন, তখন ইন্দ্রিয় পরিচালনা ও ইন্দ্রিয় সেবার কথা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে উদয় হইত না। তখন জগৎ তাঁহার সম্মুখে মধুময় বলিয়া বোধ হইত। আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য হৃদয়ে মহা উল্লাস উপস্থিত হইয়া, কাসেম প্রাণকে আনন্দালোকে উদ্ভাসিত করিত; তখন পাপ ইন্দ্রিয়ের কথা হৃদয়েও স্থান পাইত না। কাসেমের প্রাণ ক্ষেত্র-রূপ দর্শনেই মোহমগ্ন হইয়া রহিত। যতক্ষণ সে রমণীর মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে থাকিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া রহিতেন; তিনি ক্ষেত্ররূপ দর্পণে ঈশ্বরের গুণরাজি দর্শন করিতেন; ক্ষেত্রের অনিন্দ্য রূপরাশি দর্শন করিলে কাসেমের মনে ঈশ-প্রেম কথাই উদিত হইত। দর্পণ সম্মুখে রাখিলে যদ্রূপ আত্ম-প্রতিবিম্ব তন্মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, কাসেম ক্ষেত্র-দর্পণে অভিলষিত ও চির বাঞ্ছিত প্রতিবিম্ব জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেন; তদ্ধেতু ক্ষেত্রকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

কোন প্রেমিকা প্রেমিক সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, যদি প্রেমিকের ইন্দ্রিয় সেবার কথা মনে উদয় হয়, তবে জানিও সে প্রকৃত প্রেমিক নহে; প্রেম কি পদার্থ, এখনও সে তাহা জানিতে পারে নাই। ইহা পার্থিব প্রণয়, পবিত্র প্রেম নহে। ইহা দীর্ঘ কালস্থায়ী প্রেম নহে। ইহা ক্ষণস্থায়ী অশুভ জনক প্রণয়, ইহার মূল দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে।

প্রকৃত প্রেম যাহার হৃদয়ে বিরাজ করে, তিনি কখনও এ পাপ ইন্দ্রিয় সেবার কথা ভাবিবেন না। তিনি প্রেম-বৃত্তির

পরিচালনা করিতে থাকিবেন—ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিতে মনোনিবেশ করিবেন না। প্রকৃত প্রেমিকের এইরূপ চিহ্ন, প্রকৃত প্রেমই এইরূপ। আমরা প্রকৃত প্রেমের বিষয় সংপ্রতি পাঠক গণকে কিছু অবগত করাইব। প্রকৃত প্রেম কি, ও প্রকৃত প্রেমিকের আচার নীতি কিরূপ, তাহা যতদূর সাধ্য বর্ণন করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যিনি প্রীতির সহিত খোদাকে স্মরণ করেন, তিনিই প্রেমিক; খোদাতা-লাই প্রেমের লক্ষ্য স্থল; যে তাঁহাকে স্মরণ করে না, তাহার জীবন অসার। প্রকৃত প্রেমিক যখন কোন ক্লেশ যন্ত্রণায় পতিত হন, তখন তিনি হৃষ্ট চিত্তে সেই ক্লেশ যন্ত্রণাকে প্রেম করিয়া থাকেন। কেননা তিনি জানেন, কি ধন মান, কি দুঃখ-দরিদ্রতা, সকলই সেই পরম বন্ধু (আল্লাহ-তা-লা) হইতে ঘটিয়া থাকে; বন্ধু প্রাণনাশক তিক্ত গরল দিলেও, তিনি তাহা অমৃত জ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রেমিকের অন্তরাত্মাতে জলন্ত চিতা সদৃশ যে প্রেমাগ্নি অহর্নিশি প্রজ্জ্বলিত আছে, তাহা তুমি মনে করিও না; আজি তাহা পুষ্প স্বরূপ; তাহারা প্রেমাস্পদের অঞ্চল আকর্ষণ করেন না, বন্ধুর প্রেমই তাহাদের আত্মার কণ্টক ধরিয়া টানিয়া থাকে। প্রেম একটা শৃঙ্খল স্বরূপ, যাহার কণ্ঠে উহা সংলগ্ন হয়, তাহাকেই বন্ধুর দিকে অগ্রসর হইতে টানিয়া থাকে। কিন্তু এই শৃঙ্খল সাধ করিয়া কেহ পরিতে পারে না। বন্ধুর কৃপা-কটাক্ষ যাহার প্রতি পড়িয়াছে, তাহার কণ্ঠে আসিয়া সেই শৃঙ্খল

সংলগ্ন হয়, এবং তদ্ধেতু তাহার হৃদয়ে প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হয় ও তাহা সময়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া, মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সাধন করে। প্রকৃত প্রেমিক, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করুন বা বিচ্ছেদের ঔষধ সেবন করুন, তাহার জীবন ধন্য। সেই প্রেমিক দরিদ্র হইলেও রাজত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। প্রিয়তমের আশায় দরিদ্রতাতেও তিনি সুখী। তিনি মুহুর্মূহু দুঃখ রূপ সুরা-পান করেন। ক্লেশ প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু আর্ত্তনাদ করেন না। বন্ধুর স্মরণে তিনি যে ধৈর্য্য ধারণ করেন, সেই ধৈর্য্য তিক্ত নয়; বন্ধুর হস্ত স্পর্শে সেই তিক্ততা মিষ্টতায় পরিণত হয়। বন্ধুর হস্তে যিনি বাঁধা পড়িয়াছেন, তিনি সেই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে চান না। প্রেম-জালে যিনি বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি চিরকালই সেই বন্ধনে বন্দী থাকিতে ভাল-বাসেন। তিনি প্রান্তর নিবাসী ভিক্ষুক হইলেও দেশের রাজা। যিনি প্রকৃত প্রেমিক, তিনি ঈশ্বরের মন্দির চিনিয়াছেন; তাঁহাকে অন্য লোকে চিনিতে পারে না। সেই প্রেমিক আপ-নার প্রতি লোক গঞ্জনার দ্বার মুক্ত করেন—তিনি মত্ত উষ্ট্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে ভারবহন করেন। তাঁহার জীবনের গূঢ়তত্ত্ব অন্য কেহ জানিতে পারে না। অন্ধকারস্থিত অমৃতবারির ন্যায় তিনি সাধারণ চক্ষের অগোচর। তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে কুৎসিত হইলেও, পবিত্র জ্যোতিঃতে তাঁহার অন্তর সতত আলোকময়। তিনি প্রেমাগ্নির পতঙ্গ, তিনি প্রাণের শান্তি ধাম আল্লাহ তা-লাকে সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়া বেড়ান।

তিনি ধর্ম্ম রাজ্যের যাত্রী; যিনি পরমার্থ সলিলে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি প্রেমাস্পদের দর্শনের মত্ততাতে প্রাণকে তুচ্ছ করিবেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে সংসার বিভোর রাখিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বর মননে তিনি অন্য পদার্থকে বিস্মৃত হন; তিনি এরূপ ভ্রম রূপ সুরাপান করিয়াছেন। কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নয়—তাঁহার রোগের নিদান অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। "আমি চিরকাল তোমার রক্ষক আছি" এই মহাধ্বনি চিরকাল তাঁহার কর্ণে বাজে। সেই প্রেমিক বিনীত বটেন, তাঁহার পদনিক্ষেপ বিনম্র, কিন্তু ধ্বনি অগ্নির ন্যায়; তিনি বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য, কিন্তু চতুরগামী, মৃগনাভির ন্যায় নিঃশব্দ, অথচ গুণকীর্ত্তনশীল। প্রাতঃকালে তিনি অশ্রুপাত করিয়া চক্ষুকে নির্ম্মল করেন, দিবা রাত্রির কষ্ট-ও ব্যস্ততা কি, তিনি জানেন না—স্রষ্টার সৌন্দর্য্য দিকে দৃষ্টি করিতে চাহেন না। প্রকৃত প্রেমিক, বস্তুর খোলাকে হৃদয় দান করেন না, মূর্খেরাই শস্য বিহীন অসার খোলা ভালবাসে। যথার্থ খোদা-প্রাপ্তি রূপ সুরা কে পান করিয়াছেন? যিনি আপনাকে হারাইয়াছেন।

প্রেম ব্যতিরেকে বল কে তোমাকে অহং ভাব হইতে উদ্ধার করিবে? যে পর্য্যন্ত তুমি স্বার্থ ও অহংভাব নিয়া ব্যস্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আপনাকে চিনিতে পারিবে না। যে অহং ভাব শূন্য না হইয়াছে, সে ভিন্ন অন্যে এ কথার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না। যদি তুমি প্রেম ও মত্ততা রাখ, আপনার ভাবনা ছাড়িয়া দাও।

তত্ত্বদর্শী প্রেমিক একটী বিহঙ্গের স্বরে নৃত্য করিয়া উঠেন। স্বর্গীয় গায়ক কখনও নিস্তব্ধ নহেন, কিন্তু সেই সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্য কাহার কর্ণ উপযুক্ত? প্রকৃত প্রেমিকেরা জল স্রোতের নিনাদ শুনিয়াও মাতিয়া উঠেন। স্বর্গোদ্যানের পক্ষী স্বরূপ যাহার আত্মা, সে সেই সঙ্গীত শ্রবণে এত দূর ঊর্দ্ধে উড্ডীন হয় যে, দেবতারা তাহার সঙ্গে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যায়। যাহারা নিকৃষ্ট শারীরিক প্রেমের প্রেমিক, তাহাদের হৃদয় তাহাতে আরও অবসন্ন হয়। নিকৃষ্ট প্রেমিক কি শ্রোতা? সে বরং মধুর ধ্বনি শ্রবণে নিদ্রিত হয়—মত্ত হইয়া উঠেনা।

পুষ্পই প্রভাত সমীরণ সংস্পর্শে নৃত্য করিয়া থাকে—এজন্য মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ; চতুর্দ্দিকে প্রেমের মত্ততা ও কোলাহল, কিন্তু অন্ধজন দর্পণে কি দর্শন করিবে? অস্থির ও মত্ত বলিয়া খোদা-প্রেমিককে উপহাস করিও না, তিনি সাগরে ডুবিয়াছেন। তাঁহার অন্তরে খোদাতা-লার কৃপা ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হয়, এজন্য পৃথিবীকে তুচ্ছ করিয়া হাত ঝাড়িয়া থাকে, তিনি আশক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন বলিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। যে রাজ্যে তত্ত্বদর্শী প্রেমিকের চক্ষু নিপতিত, বহির্দ্দর্শী কোথায় তাহার অনুসন্ধান পাইবে? হে জগদ প্রভো! আমি যেন তোমার পবিত্র প্রেম-শৃঙ্খলে ইহকাল এবং পরকালেও আবদ্ধ থাকি।

কাসেম যখন ক্ষেত্র-সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেন, তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছেন, সে সময় ক্ষণকালের জন্যও ইন্দ্রিয় সেবার

কথা তাঁহার স্মৃতি-পথে পতিত হয় নাই—ক্ষেত্র-রূপ দর্শনেই তিনি বিভোর থাকিতেন। দীক্ষা মন্ত্রাভিলাষী ব্যক্তি গুরুর সম্মুখে যেমন দণ্ডায়মান থাকে, তিনিও ক্ষেত্র-সম্মুখে সেইরূপ দণ্ডায়মান থাকিতেন। উৎকৃষ্ট পবিত্র ভাব সে প্রেম কর্তৃক পরিচালিত হইয়া হৃদয়ে উদিত হইত। প্রকৃত প্রেমের এই কাজ যে, ইহা মানবাত্মাকে পবিত্রতার ও মহত্ত্বের দিকেই চালিত করিতে থাকে।

প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সেবা কখনও মিশ্রিত হইতে পারে না ; প্রকৃত প্রেম ও পরিচর্য্যা ২টী সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। একটী স্বর্গীয়, অন্যটী পার্থিব। আমরা আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, কাসেমও কোন রূপ ইন্দ্রিয় সেবা প্রণোদিত হইয়া ক্ষেত্রকে ভালবাসেন নাই ; কাসেমের প্রেম তাহাকে মহত্ত্বতার দিকে পরিচালিত করিয়াছিল। প্রেম মানবকে সর্ব্বদাই মহত্ত্বতার দিকে আকর্ষণ করে, প্রেমের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

আমরা বলিয়াছি, গজপতি মদ্যপ ; সে ক্ষেত্র-আবাসে থাকিতে পারিত না। সময় ২ ক্ষেত্রের আবাস হইতে তাড়িত হইয়া সে অন্যত্র গমন কবিত। কয়েক দিন পরে আবার মূঢ় গজপতি সে গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করত, গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইত ; আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ক্ষেত্র সর্ব্বদা মূর্খ গজপতিকে ঘৃণা করিতেন।

বিমলা নামে একটী নাপিতানী পার্টোরি ও আমির নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিত। বিমলা, ক্ষেত্র ইত্যাদির বাটীতেও

ক্ষৌর কার্য্য সম্পন্ন করিত, এদিকে আমির নগরের ভদ্র-মহিলারা ও ইহা দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কাসেমের সঙ্গে এই বৃদ্ধা বিমলার আলাপ হইল। যখন ক্ষেত্রমণির ক্ষৌর-কার্য্যে গমন করিত, তখনই বিমলা ধীরে ধীরে কাসেমের সমস্ত বিবরণ ক্ষেত্র সমীপে বর্ণনা করিত। ক্ষেত্রও তাহার উপযুক্ত বিবরণ সকল কাসেমকে জানাইবার জন্য বলিত। এইরূপে অতি সংগোপনে—নীরবে প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। পৃথিবীতে সদা সর্ব্বদাই প্রেমিক-প্রেমিকার সংবাদ গোপনে চলিয়া আসিতেছে।

৯ম প্রতিবিম্ব।

প্রেমিকের পত্র ও গজপতির ক্রোধ।

একদা পৌষ মাসে, দিবা সার্দ্ধ প্রহরের সময়, মৃত ভূপতি সিংহের বাটীতে ক্ষেত্র স্বীয় শয়ন-কক্ষে শয্যার প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছেন; তাহার সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণকেশরাজি, কবরি হইতে উন্মুক্ত হইয়া, ভূমি চুম্বন করিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া, মৃদুল পবন-হিল্লোলে ধীরে ধীরে দুলিতেছে। তাহার বদনমণ্ডলে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সুন্দর চিবুক দেশে রমণী কর-পল্লব স্থাপন করিয়া, চিন্তাকুল ভাবে শয্যোপরি বসিয়া রহিয়াছেন, অন্য হস্তে এক খানি পত্র শোভা পাইতেছে।

রমণী একবার সেই পত্র পাঠ করেন, অন্য বার সে পত্র চুম্বন করত মস্তকে স্থাপন করেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত যাবৎ রমণী চিন্তাকুল বয়ানে চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সুন্দর কপোলদেশে, পদ্মস্থিত শিশিরের ন্যায় ঘর্ম্ম বিন্দু শোভা পাইতেছে। অকস্মাৎ দ্বারদেশে মনুষ্যের পদ শব্দ শ্রুত হইল। অতি শীঘ্র ব্যাকুল চিত্তে রমণী পত্র খানি উপাধান নিম্নে স্থাপন করিলেন। যে গৃহে প্রবেশ করিল, সে পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত গজপতি। গাঁজার জন্য গজপতি ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছে। গাঁজা কৈ, গাঁজা কৈ, বলিয়া গজপতি চতুর্দ্দিকে গৃহস্থিত সকল পদার্থ অন্বেষণ করিতে লাগিল—ক্ষেত্রমণির শয্যার নিম্নস্থ প্রত্যেক পদার্থ সে দেখিতে লাগিল।

অকস্মাৎ গজপতি বালিশ উত্তোলন করিয়া দেখিল, এক-খানা কাগজ সেখানে রহিয়াছে। মূর্খ মনে করিল, ইহাতে বোধ হয় গাঁজা আছে। এই মনে করত গজপতি কাগজ উত্তোলন করিয়া দেখিল তাহাতে গাঁজা নাই,—তৎপরিবর্ত্তে তন্মধ্যে চারু হস্তলিপি দেখিতে পাইল; তখন আগ্রহের সহিত গজপতি তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পত্রে নিম্ন-লিখিত বাক্য কয়টী লেখা ছিল :—

"প্রাণের ক্ষেত্র!

কয়েক দিন যাবৎ তোমার অদর্শনে আমি নিতান্ত কষ্ট পাইতেছি, কষ্ট অসহ্য। তব অদর্শনে প্রাণ যেন ছটফট করি-

তেছে। প্রিয়ে, চাঁদমুখ দেখাইয়া এ হতভাগার তাপিত প্রাণ শীতল কর।”

গজপতি পড়িল, দন্ত কিট্ মিট্ করিতে লাগিল। ক্ষেত্র ধীর ও গম্ভীর ভাবে নয়নদ্বয় মৃত্তিকার উপর স্থাপন করত, শয্যা হইতে উঠিয়া, পার্শ্বে দণ্ডায়মান। গজপতি সরোষে বলিল,—

“পাপীয়সি! কে তোর সেই পাপীষ্ঠ জার? তার নাম লিখা নাই কেন? পাপীষ্ঠা, পূর্ব্বেই তোর যত কাণ্ড কারখানা আমি তোর মাতৃ-কর্ণে তুলিয়াছি, কিন্তু তোর মাতা দ্বিচারিণী, প্রমাণাভাবে সেকথা গ্রাহ্য করে নাই। আজি কুলকলঙ্কিনী এই প্রমাণ তোর মাতার কাছে নিয়া দেখ্, পাপিয়সী কি করি! গজপতি এইকথা বলিয়া রোষে কাঁপিতে লাগিল।

ক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ ধীর-গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান, নয়নদ্বয় পূর্ব্ববৎ ভূমির উপরে স্থাপিত। ভয়ের কোন চিহ্নও সে রমণীয় বদন মণ্ডলে স্থান পাইতেছে না।

তাহার দৃঢ়ত্ব-ব্যঞ্জক—অথচ তেজঃপূর্ণ সুকোমল বদন মণ্ডল দেখিলে মনে হয়, এক জন কেন, সহস্র ২ কোটি ২ গজপতির ভয়েও রমণী ভীতা হইবার নহেন। রমণী গম্ভীর—উত্তর বিহীন—নীরব—নিশ্চল নিষ্কম্প প্রদীপবৎ দণ্ডায়মান। তাঁহার দৃঢ়ত্ব ব্যঞ্জক বদন যেন গজপতির ভীতি-প্রদর্শনকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

এ বীর রমণীর হৃদয়, সামান্য কাপুরুষ গজপতির ভয় প্রদর্শনে কি ভীতা হইবে? রমণী-হৃদয় লোকে বলে অতি কোমল,

কিন্তু সত্যধর্ম্মের তেজে যখন রমণী-হৃদয় বলবান হয়, তখন সে সুকোমল রমণী-হৃদয়ের সহিত বীর শ্রেষ্ঠ ওয়াসিংটন ও প্রতিভাশালী বীরকুল শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের হৃদয়েরও তুলনা হয় না। কোমল রমণী হৃদয় কোন্ অপূর্ব্ব শক্তি বলে এত তেজীয়ান হয় ?

ধার্ম্মিক প্রবর হজরত ওমরের (রাঃ) বিধর্ম্মী অবস্থায়, যখন তিনি স্বীয় ভগ্নী ফাতেমার উপর অস্ত্রাঘাত করিতে ছিলেন—রক্ত-রঞ্জিত পবিত্র ধর্ম্মাবলম্বিনী ফাতেমা নীরবে সানন্দে ভ্রাতার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে থাকিলেন। মহাপুরুষ যীশুখৃষ্টের ন্যায় বলিলেন প্রভো ! ভ্রাতাকে ক্ষমা কর, তিনি জানেন না, কি কার্য্য করিতেছেন। তখন রমণী হৃদয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছে যে, সে দুর্ব্বল নারী হৃদয় সময় ২ কত বলবতী হয়। নানা প্রকার সুদীর্ঘ কথার আর আবশ্যক নাই। ঘটনা সাগর মন্থন করত উদাহরণ মালা গ্রন্থন করিয়া, গ্রন্থ কলেবর বর্দ্ধিত করিবার আর আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে বলিব কি হইল।

গজপতি ক্রোধের অবতার, আর ক্ষেত্র গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ! ধীরে ধীরে অন্য দুই ব্যক্তি সেই গৃহের দ্বারদেশে দর্শন দিলেন। ক্রোধে কম্পিত কলেবর গজপতি পত্র খানি হস্তে করিয়া আনয়ন করত বাহিরে আসিয়া বলিল, দেখ তো কছিম, এহস্ত লিপি কার্ ? এই বলিয়া গজপতি পত্র খানি কছিম নামক একটী মুসলমান যুবকের হস্তে প্রদান করিল।

কছিম পত্রখানি হস্তে লইয়াই দেখি ২ করিয়া গৃহ হইতে

দ্রুত বেগে চলিয়া গেল। কাসেমানুগত কছিম, হস্তলিপি চিনিয়া দ্রুত পদে বহির্দ্দেশে গিয়া পত্রখানি ছিন্ন করিয়া বলিল, ইহা শীঘ্র শীঘ্র ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। তোমার স্ত্রীর কলঙ্ক কথা কি আবার লোক সম্মুখে প্রকাশ কর গজপতি ? গজপতি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিল ; বলিল ভাল করেছ কছিম।

কছিম ইত্যাদি চলিয়া গেলে পর, পাপিষ্ঠ গজপতি, প্রমাণ ছিন্ন বিছিন্ন হইল দেখিয়া, তাহার দুই একটী বন্ধুর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিল, ও ক্ষেত্রমণিকে সুযোগ মতে ধরিবার সন্ধানে থাকিল।

১০ম প্রতিবিম্ব।

পশু গজপতির বর্ব্বরতা।

রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে, ক্ষেত্রমণি ইত্যাদি আহার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ক্ষেত্র আহারান্তে শয্যোপরি গম্ভীর ভাবে আলস্য প্রযুক্ত শয়ন করিয়া আছেন। সে শয়ন-প্রকোষ্ঠে গজপতি শয়ন করিতে পাইত না। ক্ষেত্র গজপতিকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে নীরবে ক্ষেত্রের প্রকোষ্ঠে ৩ জনা লোক তাহার অগোচরে প্রবেশ করিল। প্রত্যেকের হস্তে সরু বেত ; ১ম জন গজপতি, ২য় জন সুরেশ, ৩য় জন কামিনী। গজপতির হস্তে একখানি বস্ত্র ও এক গাছি রজ্জু।

ক্ষেত্র আলস্যে শয়ন করিয়া অর্দ্ধ নিদ্রিতা হইয়াছেন, গজপতি দ্রুত বেগে তাহার নিকটে গিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত করিল। সুরেশ গজপতির হস্ত হইতে রজ্জু নিয়া সে স্নেহের কমল কলি সোণার প্রতিমা ক্ষেত্রকে নিকটবর্ত্তী শালাতে (বাঁশে) বাঁধিল। ক্ষেত্র জাগরিত হইয়া কিছুই বলিলেন না—বুঝিলেন, ইহা গজপতির পূর্ব্ব ক্রোধের পরিণাম; ক্ষেত্র কিছু বলিবার ইচ্ছাও করিলেন না।

বন্ধন কার্য্য সমাধা হইলে পর গজপতি বলিল, আমি যদি মুখের বস্ত্র সরাইয়া নেই, তবে তুই চীৎকার করিবি কি না? ইঙ্গিতে ক্ষেত্র প্রকাশ করিল যে, সে চীৎকার করিবে। গজপতি মুখ হইতে বস্ত্র সরাইল। গজপতি বলিল, আমি যাহা বলিব, তাহার স্পষ্ট উত্তর দিলে রক্ষা, নতুবা এই তিন গাছি বেত দেখিতে পাইতেছিস্, এই সব তোর পৃষ্ঠে ভাঙ্গিব।

গজপতি জিজ্ঞাসিল—বল্ কে তোর জার!

সদম্ভে সাহঙ্কারে রমণী বলিলেন, কেহই আমার জার নয়।

গজপতি—তবে এ পত্র কোথাকার, স্পষ্ট করিয়া বল্!

ক্ষেত্র—এ পত্র কাসেমের নিকট হইতে প্রেরিত।

গজপতি—কাসেম তোর কে?

ক্ষেত্র—কাসেমই আমার প্রকৃত পতি।

গজপতি—আর আমি?

ক্ষেত্র—তুমি কিছুই নও।

সরোষে গজপতি ক্ষেত্রের কোমল পৃষ্ঠে সবলে এক

বেত্রাঘাত করিল। রমণী কিছুই বলিলেন না—আহা-উহু বা খেদোক্তিও করিলেন না, চক্ষের জলও ফেলিলেন না।

গজপতি—কাসেম মুসলমান, তুই কি?

ক্ষেত্র—প্রাণ নাথ যাহা—আমিও তাহাই।

গজপতি—দ্বিশ্চারিণী, বল্ তুই কাসেমের প্রেম পরিত্যাগ করিবি কি না? বল্ তুই আমাকে তোর প্রকৃত পতি বলিবি কি না?

ক্ষেত্র—কখনই না, কখনই না।

গজপতি সরোষে পুনঃ আর এক বেত্রাঘাত করিল। বেত্রাঘাতে কোমল দেহ স্ফীত হইয়া উঠিল; রমণী অনেক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াও অম্লান বদনে তাহা সহ্য করিয়া রহিলেন। গজপতি পুনঃ বলিতে লাগিল—বল, কাসেমকে ভুলিবি কি না? এবং আমাকে ভালবাসিবি কি না?

ক্ষেত্র—বৃথা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, প্রাণান্তেও তোমাকে হৃদয়ে স্থান দান করিব না; যাও গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও।

রমণী এই কথা বলিবা মাত্র গজপতি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বেত্র হস্তে লইয়া সবলে রমণীর কোমল পৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিল। সপাৎ সপাৎ করিয়া কামিনী-দেহে বেত্রঘাত হইতে লাগিল, আঘাত-স্থান ফুলিয়া গেল, কামিনী-দেহ রক্ত রঞ্জিত হইল। সে আবার বলিল—এখনও বল্, রক্ষা পাবি।

কামিনী বলিলেন, কখনও না, তুমি কে, যাও, কাসেম আমার প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর—তিনিই আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।

বিষম কোলাহল শুনিয়া সরলা অন্য গৃহ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের গৃহে প্রবেশ করিল। তখন সুরেশ ও কামিনী চলিয়া গেল। সরলা কন্যার অবস্থা দেখিয়া গজপতিকে ভর্ৎসনা করত বলিল, দূর হ পাপিষ্ঠ, এখনই আমার বাটী হইতে দূর হইয়া যা; তুই এ জন্মে আর এ বাড়ীতে মুখ দেখাস্‌নে। আমার কন্যা পতি হীনাবস্থায় থাকুক, ক্ষতি নাই; তোর ন্যায় মূঢ় ও বর্ব্বর স্বামীর আবশ্যক নাই।

মাতা কন্যাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং পর দিবস গজপতিকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মূর্খ গজপতি অন্যত্র চলিয়া গেল।

১১শ প্রতিবিম্ব।

সরলার মৃত্যু।

ক্ষেত্রের জননী সরলা ভয়ানক পীড়িতা, চলচ্ছক্তি ও বাক্‌-শক্তি রহিতা হইলেন। তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে তীর্থস্থান কাশীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন, তথায় যাওয়ার পূর্ব্বাবধিই তিনি কফের পীড়ায় কাতর ছিলেন; তীর্থ হইতে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া অধিকতর পীড়িতা হইলেন, বৃদ্ধার বাঁচিবার আশা নাই—মৃত্যু অতি সন্নিকট।

সরলা মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা, গাত্রোত্থান করিবার সাধ্য নাই, মল-মূত্র ত্যাগ করা পর্য্যন্তও গৃহেই হইতেছে।

ক্ষেত্রমণি শয্যা পার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশি মাতৃসেবা করিতেছেন ; আহার নাই, বিহার নাই, খাদ্য ও নিদ্রার সংবাদ নাই, সরলা বালিকা অবিশ্রান্ত ভাবে মাতার শুশ্রূষা করিতেছেন।

কাসেমও ক্ষেত্রের জননীকে দর্শন করিবার জন্য প্রায়ই আগমন করেন এবং স্বীয় জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর ভালবাসার ক্ষেত্রমণির মাতৃ ভক্তি দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হন। প্রতিবেশী সকলেই সময় ২ আসিয়া যথা প্রথা রোগী সন্দর্শন করিতেছেন। কিন্তু অহরহ কেহই থাকিতেন না, কেবল সেই বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন ক্ষেত্রমণি দিবানিশি মায়ের পার্শ্বে বসিয়া থাকেন।

সরলার সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহকারী একমাত্র ভ্রাতা ছিলেন, তাহার নাম চন্দ্রনাথ। সরলা মুমূর্ষূ কালে তাহাকে আনিয়া বলিলেন, আমার জীবন প্রদীপ অচিরে শেষ হইবে, প্রাণাধিকা কন্যাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম, যেন তাহার মূর্খ পতি কর্ত্তৃক জ্বালাতন না হয়। আমি অভাবে যদি সেই মূর্খ কন্যাকে যন্ত্রণা দেয়, তবে তাহাকে দশটী মাত্র টাকা দিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দিও। এই নেও সেই টাকা তোমার নিকট রাখ, এবং সেই দুষ্টকে একবার আমার সাক্ষাতে আনয়ন কর।

চন্দ্রনাথ লোক পাঠাইলে, গজপতি সরলার পীড়ার সংবাদ শ্রবণে বাটীতে আসিল ; দেখিল সরলা মুমূর্ষূ অবস্থায় শয্যায় লুণ্ঠিতা। প্রাণ-বিহঙ্গম দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সে তখন ক্ষেত্রমণির সঙ্গে আর কোন আলাপ করিল না, তাঁহাকে কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না।

সরলার আয়ুষ্কাল ধীরে ধীরে ফুরাইতে লাগিল—মৃত্যু সন্নিকটে পঁহুছিল—সরলা দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে লাগিলেন। সরলা মৃত্যুকালে গজপতিকে সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, বাছা! তুমি একবার আমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে, ক্ষেত্রকে কখনও কষ্ট দিবেনা; ক্ষেত্র গজপতির উত্তরের পূর্ব্বেই বলিলেন "না, মা আপনি ও বিষয় ভাবিয়া আর রোগ বৃদ্ধি করিবেন না, এখন এসব ভাবিতে নাই, আপনি হরিনাম করুন।"

সরলা অতি দুঃখিত, অথচ রোষ যুক্ত স্বরে বলিলেন, "না মা ক্ষেত্র, তুমি কি আশা কর আমি আবার উঠিব? মা, সে আশা বৃথা, জীবন অবসান হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। আমি মরিলে পর কে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? জগতে তুমি একাকিনী, আমার শেষ অনুরোধ, ক্ষেত্র জানিয়া শুনিয়া কার্য্য করিও।" অল্পক্ষণ পরেই যমদূত আসিয়া সরলার শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। ধীরে ধীরে সরলার জীবন অবসান হইতে লাগিল। প্রাণ-বিহঙ্গম পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া সুবিস্তৃত গগনাভিমুখে উড়িয়া গেল। পিঞ্জর পড়িয়া রহিল—জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

ক্ষেত্র মাতৃ-শোকে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

১২শ প্রতিবিম্ব।

—o—
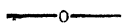
শ্যামা সুন্দরী ভগিনী ও ক্ষেত্রমণির শেষ পত্র।

রাত্রি ১০টা অতীত হইয়াছে, আকাশে শশধর এখন পর্য্যন্ত উদিত হন নাই, অসংখ্য নক্ষত্র কেবল আকাশে কিরণ দিতেছে। নক্ষত্র সাজে সজ্জিত হইয়া আকাশ অপরূপ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মাতৃহীনা ক্ষেত্রমণির জননী মৃত্যুর পরে কয়েক দিন চলিয়া গিয়াছে। জননী-শোক ক্রমশঃ ক্ষেত্রমণি ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

একদা যামিনী ১০টার সময়ে বাটী পার্শ্বস্থ এক নিভৃত স্থানে ক্ষেত্র, স্বীয় প্রাণ প্রিয় কাসেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কাসেম স্বীয় প্রেমিকার মাতার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক, ক্ষেত্রমণির মুখ পানে অবলোকন করত দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি সুখে নাথ আমি আর এখানে থাকিব ? আমার জননী চলিয়া গিয়াছেন, পশু গজপতি সর্ব্বদা আমাকে উৎপীড়ন করিতেছে। অদ্য সে বাটীতে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাই এ অবসরে প্রিয়তম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সময় পাইলাম।"

কাসেম—তবে কি ইচ্ছা প্রিয়ে? তোমার ইচ্ছা সফল হউক। তোমার যাহা অভিরুচি, বল।

ক্ষেত্রমণি—আর ৫ দিন পরেই মাতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবে; আগামী শুক্রবার রাত্রিতে এখানে আসিলে নাথ! আমি তোমার সঙ্গে এ বাটী পরিত্যাগ করিব।

কাসেম—তোমার যে অতুল বিভব, ঘর আছে, জমি বাড়ী ও নগদ টাকা কড়ি আছে, তাহা কি করিবে?

ক্ষেত্র—নাথ! আমি এসব কিছুরই প্রত্যাশী নহি। বিশেষতঃ এ সবের দিকে মন দিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণ বাধা জন্মিবে।

কাসেম—তবে প্রিয়ে তোমার যেমত ইচ্ছা, আমার কোন আপত্তি নাই। হে জগদীশ্বর, প্রিয়ার ইচ্ছা পূর্ণ কর।

নীরব নির্জ্জন স্থানে প্রেমিক-প্রেমিকার এইরূপ আলাপ হইতে চলিল। অদ্যই সকল কথা তাঁহারা নির্দ্ধারিত করিলেন।

সরলার মৃত্যুর পরে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত গজপতি ক্ষেত্রকে আর বড় উৎপীড়ন করিতনা। ক্ষেত্রের সঙ্গে বড় আলাপ পর্য্যন্তও করিতনা। শ্রাদ্ধান্তে ক্ষেত্রকে বলেই হউক, আর ছলেই হউক—হস্তগত করিবে এই তাহার ইচ্ছা। এই জন্যই পাপাত্মা ক্ষেত্রকে এতদিন কিছু বলে নাই। শ্রাদ্ধান্তে সমস্ত দুঃখের প্রতিশোধ লইবে বলিয়া স্থির করিয়া রহিল।

ক্ষেত্রের জীবন তাহার পিত্রাবাসে বিষাদময় হইয়া গেল। হৃদয়ের কষ্ট তাঁহাকে পুড়িতে লাগিল। কষ্টে ক্ষেত্র সংসারকে

জ্বলন্ত নরকবৎ দেখিতে লাগিল। যে কেহ সান্ত্বনা করিবার ছিল—তিনি ক্ষেত্র-জননী; তিনিও এখন নাই। ক্ষেত্রের সহিত যে কেহ এখন প্রফুল্ল বদনে আলাপ করিবেন, এরূপ কেহ আর নাই। পার্টোরি গ্রামের মধ্যে কি তবে তাহার দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হইবার কেহই নাই? পরমেশ্বর কি এতই অবিচারী? কখনই না, তিনি অবিচারী হইতে পারেন না। পার্টোরি গ্রামেও ক্ষেত্রের একজন সখী আছেন। একজন তাঁহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী আছেন। তিনি পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিতা পতিব্রতা সতী শ্যামা সুন্দরী—কাসেমের ধর্ম্ম-ভগিনী।

শ্যামা সুন্দরী ক্ষেত্রকে আন্তরিক ভাল বাসেন, ক্ষেত্রও তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস ও ভক্তি করেন; ক্ষেত্রের সহিত কাসেমের প্রেম-বৃত্তান্ত শ্যামা সুন্দরীও জানা আছেন। কাসেমের সহিত ক্ষেত্রের সাক্ষাৎ না হইলে, ক্ষেত্রের জীবন যে বিষময় হইয়া উঠিত, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনি ক্ষেত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, ক্ষেত্রের অহিত জনক কোন কার্য্য করিতেন না। ক্ষেত্র ভীষণ বিষাদ কালে যখন চতুর্দ্দিক বিষাদ ময় দেখিতে পাই-তেন, শ্যামার পার্শ্বে আসিলে তাঁহার বিষাদ-সন্তপ্ত মনও কথঞ্চিৎ শীতল হইত; শ্যামাতে ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইতেন।

ধীরে ধীরে শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া পঁহুছিল—শ্রাদ্ধ কার্য্য বিধিমতে সম্পন্ন হইল—শ্রাদ্ধের গোলমালও মিটিয়া গেল।

শ্রাদ্ধের পর দিন কাসেম এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, বলা বাহুল্য যে, বিমলা এই পত্র বাহিকা।

"পত্র।

প্রিয়তম!

মন স্থির করিয়াছি, বিষাদ বড় তিক্ত—আর সহ্য হয় না নাথ! মানবাত্মা কি কখনও সর্ব্বদা দুঃখে মগ্ন থাকিতে চায়? এ কয় দিন মনে মানস-বৃত্তির ভয়ানক আন্দোলন-ঝটিকা হইতেছিল, কি করিব, কিছুই স্থির ছিল না। এজন্য প্রিয়তমের নিকট পত্র লিখিতে বা সংবাদ দিতে পারি নাই। এখন মানসে আর ঝটিকা নাই—আন্দোলন আর নাই। মন শান্ত হইয়াছে—উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছি। গন্তব্য পথে শীঘ্রই চলিব—পশ্চাতে যাহারা রহিবে, তাহাদের দিকে দৃষ্টি করিব না। হিন্দু-ধর্ম্মে আমার আর একটুও আস্থা নাই। আমি সে ধর্ম্মে আর তিষ্ঠিতে পারিব না, আমাকে সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতেই হইবে। এখন আমার মন আপনার জন্য লালায়িত হইয়া রহিয়াছে, কবে দর্শন পাইব?

মোট কথা প্রিয়—প্রাণাধিক! আমি মুসলমান হইব; সত্য ধর্ম্ম-পথে চলিব—আমি হিন্দু থাকিব না। সত্য পরমেশ্বরকে পূজিয়া জীবনকে গৌরবান্বিত করিব। উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) মিলিয়া অদ্বিতীয় প্রভুর উপাসনা করিব, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আগত কল্য বৃহস্পতিবার গজপতি বাটীতে থাকিবেন না, রাত্রি ১১ টার সময় প্রাণাধিক বাটী-পার্শ্বে আসিবেন, আমি সেই রাত্রেই হিন্দু ধর্ম্মের নিকট হইতে বিদায়

গ্রহণ করিব। বাটী হইতে চির দিনের জন্য বিদায় লইয়া প্রাণাধিক! আপনার সঙ্গে চলিয়া যাইব। প্রাণেশ! ইহাতে যেন কোন প্রকার ত্রুটী না হয়; ইতি।

আপনার দাসী—

ক্ষেত্রমণি।"

কাসেম পত্র পাঠ করিলেন, হৃদয়-সমুদ্রে কিরূপ আনন্দ লহরী বেগে সমুত্থিত হইল, আমি মানব—আমি তাহা কি বুঝিব? একমাত্র পরমেশ্বরই তাহা জানেন।

মনোরথ শীঘ্র পূর্ণ হইবে ভাবিয়া, কাসেমের প্রাণে আনন্দের উচ্ছ্বাস ছুটিল—আনন্দে কাসেমের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। অনবরত প্রেমিকার মুখচন্দ্র অবাধে দর্শণ করিতে পারিবেন ও ধর্ম্মানুসারে স্বীয় জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে একত্রে-বিভু উপাসনা করিবেন ভাবিয়া কাসেমের প্রাণ অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রে ঝাপ দিল।

কাসেম সে নিশাকালে কতই চিন্তা করিলেন, আমি মানব তাহা কি বুঝিব? অন্তর্য্যামীই তাহা জানিতে পারেন।

১৩শ প্রতিবিম্ব।

ধর্ম্ম পরিগ্রহ।

নিশা চলিয়া গেল, বৃহস্পতিবার আসিল;—কাসেম ও ক্ষেত্রের সুখ-সম্মিলনের দিনও আগমন করিল। কাসেম শয্যা ত্যাগ করত অন্য কার্য্যে গমন করিলেন।

বৃহস্পতিবার চলিয়া গেল, শুক্রবারের সন্ধ্যা আসিয়া পঁহুছিল; তৎসঙ্গে পুণ্যাত্মার পুণ্য কার্য্য সহায় দাত্রী ও পাপীর পাপ কার্য্যের প্রশ্রয় দাত্রী (রজনী), অন্ধকার সঙ্গে লইয়া, স্বীয় অন্ধকার জাল, ধরা সাম্রাজ্যে বিস্তার করত ভূমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। সে অন্ধকারের সহায়ে কত ধার্ম্মিক ব্যক্তি নীরবে, শান্ত ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করত জীবন সার্থক করিতেছেন, ও কত পাপাত্মা নিশা সমাগমে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া জঘন্য পাপ কার্য্যাদি সম্পন্ন করত, পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিতেছেন।

অতএব হে পুণ্যাত্মার সাহায্যকারিণী ও পাপীর প্রশ্রয় দাত্রী রজনী তোমায় প্রণাম! তোমার দুইটী পক্ষ আছে, একটী শ্বেত, পবিত্র; অপরটী কৃষ্ণ, অপবিত্র। একটী স্বর্গীয় কিরণে উজ্জ্বল, অপরটী নরকান্ধকারে তমসাচ্ছন্ন। শ্বেতপক্ষ ছায়া তলে হে নিশা দেবি! পুণ্যাত্মাদিগকে আশ্রয় দাও। কৃষ্ণপক্ষ তলে রজনী পাপীদিগের পাপ কার্য্য লুক্কায়িত রাখ, শত নমস্কার হে রজনী তোমায় শত নমস্কার! বল দেখি তোমার কোন্ পক্ষের নীচে, পরমেশ্বর আমাকে স্থাপিত করিবেন? রজনী তোমার শ্বেত পক্ষের নীচে মানব অতি অল্প—স্থান অনেক; বল, আমি কি সেখানে স্থান পাইব?

চন্দ্র আজি উজ্জ্বলতর কিরণ প্রকাশ করত গগনমণ্ডলে দেখা দিলেন; সমস্ত জগৎ আজি কাসেম ও ক্ষেত্র-নেত্রে মধুময় হইয়া গেল। ধীরে ধীরে নিশা ১১টা চলিয়া গেল,

আজি নিশা বড় নীরব ও মধুর; গোল নাই, কোলাহল নাই, সমস্ত জগৎ আজি প্রশান্ত।

১১টার সময় বাটীর নিকটে বৃক্ষচ্ছায়ায় কাসেম একটী অনুগত বিশ্বাসী ভৃত্য সঙ্গে করিয়া পঁহুছিলেন। বাটীর দিকে অনিমিষ লোচনে কাসেম চাহিয়া রহিলেন। হৃদয়ের তৎকালীন অবস্থা আমি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইবনা।

ক্ষেত্র সে নিশিতে স্বীয় সুযোগ মতে যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্রাদি ও যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া একটী পুটলী বাঁধিয়া ১১টার সময় গবাক্ষ-দ্বার দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং হিন্দু-ধর্ম্মের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কাসেমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কাসেম ক্ষেত্রকে দর্শন করত সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। হৃদয়েশ্বরীকে সঙ্গে লইয়া নিশা ভাগেই তিনি পার্টোরি গ্রাম পরিত্যাগ করত, স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

শুভ দিবসে, শুভ সময়ে, কাসেমাবাসে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ক্ষেত্রমণি মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। শুভ লগ্নে ক্ষেত্র, কাসেম-হস্তে ন্যস্ত হইলেন। আমিন! আমিন!!

এদিকে পার্টোরি গ্রামে প্রাতে উঠিয়া লোকে দেখিল, ক্ষেত্রের কক্ষ শূন্য। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। অবশেষে ক্রমশঃ জানা গেল, ক্ষেত্র মুসলমান-ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া কাসেমের অর্দ্ধাঙ্গিণী রূপে তাঁহার বাটীতে সুখে জীবন যাপন করিতেছেন। গ্রামে কয়েক দিন পর্য্যন্ত

এই বিষয়ের বাক্-বিতণ্ডা চলিল, অবশেষে সকলই নীরব হইল। ভাবিল যে, এ বিষয়ে বৃথা আন্দোলন করিয়া কেবল মন নষ্ট করা বই আর কিছুই নয়। ক্ষেত্রকে মুসলমান আবাসে তাঁহার আত্মীয়েরা রীতিমত আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্ষেত্র **মণিজা** নামে খ্যাতা হইলেন।

হতভাগ্য গজপতিকে সেই দিন হইতে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।